সেকুলার হিন্দুর ইস্‌লাম প্রচার: প্রলাপ ও প্রতারণা

অধ্যাপক সুহাস মজুমদার

হিন্দুত্ববুক্স

সেকুলার হিন্দুর ইস্‌লাম প্রচার : প্রলাপ ও প্রতারণা

সুহাস মজুমদার

সেকুলার হিন্দুর ইস্‌লাম প্রচার : প্রলাপ ও প্রতারণা

সুহাস মজুমদার

হিন্দুত্ববুক্স

বইটি প্রকাশে প্রুফ সংশোধনের যাবতীয় আর্থিক ব্যয়ভার বহন করেছেন শ্রী দেবদত্ত মাজী (সভাপতি, সিংহবাহিনী), শ্রী দেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রী জয়দীপ কুমার মিত্র, শ্রীমতী শ্রীতমা দেবনাথ, শ্রী রাজা দেবনাথ, শ্রী গোপাল বিশ্বাস, শ্রী ধ্রুবজ্যোতি পাঠক, শ্রী জিৎ মুখোপাধ্যায়, শ্রী অরণ্যদেব মণ্ডল, শ্রী জয়ন্ত কর্মকার এবং তাঁর বন্ধুরা, শ্রী সৌভিক দে, শ্রী কৌশিক এবং অন্যান্যরা, তাঁরা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

https://hindutvabooks.com

https://facebook.com/hindupustakkendra

https://twitter.com/hindutvabooks

mailto:hindutvabooks@gmail.com

https://t.me/hindutvabookschannel

মুখবন্ধ : 'সেকুলার হিন্দু'র ইসলামনিষ্ঠ ভাবনাচিন্তা

অধ্যাপক অম্লান দত্ত সম্প্রতি 'ইসলাম প্রসঙ্গে কিছু ভাবনাচিন্তা' নামে একটা ধ্যানগম্ভীর তথা গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রবন্ধটা ১৮/৬/৯৪ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা হয়। নানা কারণে এই লেখাটা প্রতিবাদের যোগ্য।

প্রথমত, লেখাটা ইসলাম ও মুসলমান সমাজের তুলনায় হিন্দুর ধর্ম ও সমাজকে হেয় করবার জন্য লেখা হয়েছে কিন্তু এই হেয়করণের পক্ষে যুক্তি যা দেখানো হয়েছে তা অতি অসার।

দ্বিতীয়ত, শুধু ইসলামের সুবিদিত দাসপ্রথা ও জেহাদতত্ত্ব সম্বন্ধে নয়; ইসলামের তথাকথিত 'সর্বমানবিকতা' তথাকথিত 'সামাজিক সাম্য' এবং তথাকথিত 'যুক্তিবাদ' সম্বন্ধে এই লেখক যা কিছু লিখেছেন তার সবই ভুল। এই ভুলের পাঁচালিটা বিনা প্রতিবাদে প্রচারিত হতে দেওয়া যায় না।

এই দুটি হচ্ছে বিদ্যাচর্চার দিক থেকে প্রতিবাদের বিষয়। অধ্যাপক অম্লান দত্ত বিদ্বান বলে পরিচিত—তিনি দু-দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। এরকম বিদ্বান যদি অবিদ্যার ব্যবসায়ী হয় তবে আমাদের মতো অবিদ্বানও দু-এক কথা না বলে পারে না। কিন্তু বিদ্যা-অবিদ্যার কথা না ধরে শুধু কেবল দেশের কল্যাণচিন্তার দিক থেকেও লেখাটা প্রতিবাদের যোগ্য। পূর্বভারতের উপর বিশেষভাবে, এবং সারা ভারতের উপর সাধারণভাবে, জেহাদী ইসলামের যে প্রাণঘাতী পদসঞ্চার বম্বে ও কলকাতার সাম্প্রতিক বিস্ফোরণে (মার্চ, ১৯৯৩) প্রকাশ পেয়েছে, তার কথা মনে রাখলে ইসলাম এখন আর নিন্দাপ্রশংসার বিষয় নয়, ওটা আতঙ্কের বিষয়। এই বোমাবাজির আতঙ্কের সঙ্গে যোগ করতে হবে ইসলামী অনুপ্রবেশের বিষয়টা, এর দ্বারা ভারতের পূর্বাঞ্চলের Islamisation এখন আর দুঃস্বপ্ন নয়, ওটা দুর্বাস্তবের চেহারা পেয়েছে। যারা এই পরিস্থিতিটা জানে, তারা যদি বিদ্বান হয়, তবে তারা কখনো এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে ইসলামের তুলনায় সনাতন ধর্মের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নিয়ে মাথা ঘামাতে পারে না—কেননা সকল কাজেরই সময়-অসময় আছে। ঘরে যখন আগুন লাগে তখন লোকে প্রাণপাত করে নিজের কমজোরি বাসাটাই সামলাতে যায়, অগ্নিসংযোগকারীর বাসার শ্রেষ্ঠতা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। ইসলামী বাসার আদৌ কোনো শ্রেষ্ঠতা আছে কিনা সে অত্যন্ত সন্দেহের বিষয়, কিন্তু থাকতোই যদি, তবু তার বোমাবাজির সময়টা তার গুণগানের সময় নয়। এইজন্য মনে করি বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের বিদ্বানদের ইসলামপ্রশস্তি বড় বিপজ্জনক ব্যাপার। আর কিছু না হোক এতে আমাদের আত্মরক্ষার উদ্যমটাই ব্যাহত হবে। এদিক থেকেও অম্লান দত্তের লেখাটা প্রতিবাদের যোগ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলাম কি সর্বমানবিক ধর্ম?

ইসলামের তথাকথিত 'সর্বমানবিকতার' তত্ত্বটা অধ্যাপক অম্লান দত্ত যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সে বড় উদ্ভট। সন্দেহ নেই, তিনি ইংরেজি universalism অর্থেই 'সর্বমানবিকতা' শব্দের প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু ব্যাখ্যা যা দিয়েছেন তাতে 'সর্বমানবিকতা'র মানে দাঁড়িয়েছে 'সর্বগ্রাসিতা'। ইসলামে এরকম 'সর্বমানবিকতা' অবশ্যই আছে, —বস্তুত ইসলামের গোটা ইতিহাসটাই বিধর্মীর উপর সর্বগ্রাসী আক্রমণের ইতিহাস। মধ্যযুগের আদ্যন্ত জুড়ে আরব আর তুর্কি মুসলমানের গা-জোয়ারি সর্বমানবিকতার দৃষ্টান্ত-সংখ্যা এত বিপুল যে অম্লান দত্ত ইতিহাসের ধার দিয়েও যাননি। কিন্তু ইতিহাসকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে সর্বমানবিকতার তিনি যে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতেও ইসলামের আগ্রাসী মূর্তিটা চাপা থাকেনি। তিনি বলেন—

"ইসলাম এক সর্বমানবিক ধর্ম। ইহুদী ধর্মের সেই সর্বজনীনতা নেই। সেখানে ঈশ্বর বা জেহোবাহ বেছে নিয়েছিলেন এক বিশেষ উপজাতীয় গোষ্ঠীকে। ইসলাম ঐরকম কোনো জাতীয় অথবা উপজাতীয় সীমায় আবদ্ধ নয়। আল্লার বাণী জাতিনির্বিশেষে সব মানুষেরই জন্য, যে কেউ সেই বাণী গ্রহণ করতে পারে। এই অর্থে ইসলাম সর্বমানবের ধর্ম।"

অধ্যাপক অম্লান দত্ত তাঁর এই 'সর্বমানবিকতা'র তত্ত্ব-ব্যাখ্যায় ইহুদীদের নামটা না নিলেই ভালো করতেন। কেননা ইহুদী একেশ্বরবাদের জাত্যভিমানী গোঁড়ামির সঙ্গে বিধর্মি-উৎসাদনের সর্বাত্মক সংকল্প যোগ করেই ইসলাম তার তথাকথিত সর্বমানবিকতার অভিযানে যাত্রারম্ভ করে এবং তার সেই আগ্রাসী অভিযানের প্রথম বলি হয় ইহুদীরাই। ইসলামের আদি ইতিহাস হচ্ছে ইহুদীবিতাড়নের ইতিহাস, ইহুদীলুণ্ঠনের ইতিহাস এবং ইহুদীনিপাতের ইতিহাস। পয়গম্বর যুগের মদিনায় প্রধান ইহুদীগোষ্ঠী ছিল তিনটি—তাদের নাম বনি কায়নুকা, বনি নাজির এবং বনি কুরাইজা। প্রথমে তাড়ানো হয় কায়নুকা গোষ্ঠীকে (৬২৪ খ্রী.)। পরের বছর নাজির গোষ্ঠীকে বিদায় করে তাদের সমস্ত জমিজমা লুট করা হয় (৬২৫ খ্রী.)। দুবছর পরে সবংশে নিপাত করা হয় কুরাইজা গোষ্ঠীকে (৬২৭ খ্রী.)। তার পরের বছর বনি খায়বার নামে মদিনা-বহির্ভূত ইহুদী গোষ্ঠীর সর্বস্ব লুট করে তাদেরকে আপন জমিতে মুনিষ খাটার কাজে লাগানো হয় (৬২৮ খ্রী.)। অম্লান দত্ত ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে তত্ত্বকথার চোঁয়াঢেঁকুর তুলেছেন—কিন্তু এই তিন গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তত একটির বিতাড়নের পিছনে যে তত্ত্বটা লুকিয়ে ছিল এবং কোরানে যার বিবৃতি আছে সেইটিই তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে। নাজির গোষ্ঠীর নির্বাসন নিয়ে কোরানে একটা পুরানো অধ্যায় বা সূরা আছে—ওটার নাম সূরা হাশর বা 'নির্বাসন'। সেখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে—

"[Allah] it is who caused the people of the Scripture who disbelieved to go forth from their homes unto the first exile" (K59/2)।

অর্থাৎ আল্লাই কেতাবী[1] ইহুদীদেরকে প্রথম বনবাসে পাঠান এবং তার কারণ হচ্ছে ইসলামে অবিশ্বাস (disbelief)। এই কোরান-বাণীতে ইসলামী সর্বমানবিকতার তত্ত্বটা খুব পরিষ্কার ভাবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কাফের বা বিধর্মীদের সবংশে উৎসাদনই ইসলামী 'সর্বমানবিকতা'র যথার্থ অভিব্যক্তি।

প্রত্যাদিষ্ট জাত আর প্রত্যাদিষ্ট উম্মা[2] : (Chosen People andChosen Ummah) ['উম্মা' শব্দের মানে ইসলামের প্যান ইসলামী সংঘশক্তি]।

আরেকটা অভিব্যক্তি হচ্ছে মুসলমানকে সারা দুনিয়ার Chosen People হিসাবে ঘোষণা করা,—ইহুদীদের Chosen People তত্ত্ব তার কাছে ছেলেখেলা। প্রামাণিক হাদিসে পয়গম্বরের এক সহচর জানিয়েছেন—

"আমরা মসজিদে বসেছিলাম, এই সময় আল্লার রসুল এসে বললেন, চল ইহুদীদের কাছে যাওয়া যাক। আমরা তাঁর সঙ্গী হয়ে ইহুদীদের কাছে গেলাম। আল্লার রসুল ডেকে বললেন, হে ইহুদীর দল, তোমরা ইসলাম কবুল কর; তাতে তোমরা নিরাপদ হবে। ইহুদীরা বলল, হে আবুল কাসিম, আপনি আমাদের আল্লার বাণী শোনালেন।[3] তখন রসুলুল্লা বললেন, হে ইহুদীর দল আমি চাই তোমরা ইসলাম কবুল করে নিরাপদ হও। (ইহুদীরা একই উত্তর দিল। এইরকম তিনবার উত্তর-প্রত্যুত্তরের পরে) পয়গম্বর বললেন, "তোমাদের জানা উচিত সারা দুনিয়ার মালিক আল্লা আর তার রসুল। আমার ইচ্ছে তোমাদের এ-দেশ থেকে তাড়িয়ে দিই। তোমাদের মধ্যে যার যা সম্পত্তি আছে তা বেচে দিক, তা নইলে জানিয়ে দাও, সারা দুনিয়ার মালিকানা আল্লার আর রসুলের।" [সহী মুসলিম ৪৩৬৩ নং হাদিস]

এই হাদিসে ইসলামের সর্বমানবিকতার মানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে। ইহুদীরা জেহোভার chosen people ছিল শুধু 'কানান' দেশের মালিকানার দিকে তাকিয়ে, আর মুসলমানরা আল্লার chosen people ধার্য হয় সারা দুনিয়ার মালিকানার জন্য। এইজন্যই মুসলমানরা বলে, সারা দুনিয়াটাই তাদের mandated territory। ইসলামের সর্বমানবিকতা হচ্ছে এইরকম। অম্লান দত্ত Imperialism আর Universalism-কে গুলিয়ে ফেলেছেন। তিনি বোঝেননি ইসলামের সর্বমানবিকতা aunexationism-এর নামান্তর।[4]

ইসলামের সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে কোরানবাণী: কথাটা কোরানে খুব স্পষ্টাক্ষরেই প্রকাশ পেয়েছে। কো. ৮/৩৯ এবং কো. ২/১৯৩ আয়াতে মুসলমানদের ডেকে বলা হয়েছে,

Make war on them until Idolatry is no more and Allah's religion reigns supreme (N. J. Dawood-এর অনুবাদ)

[অন্য অনুবাদে Idolatry'র জায়গায় আছে persecution; কোনো কোনো অনুবাদে আছে civil discord। কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে আল্লার ধর্ম চাপানোর কথাটা কোনো অনুবাদেই চাপা পড়েনি।]

কো. ৯/৩৩ এবং আরো দুয়েক জায়গায় আছে,

"পৌত্তলিকরা যতই মন খারাপ করুক, বাকি সব ধর্মের উপর জয়যুক্ত করবার জন্যই আল্লা

---

[1]কোরানে ইহুদী-খ্রীস্টানকে কেতাবীজাত বলে, কেননা ইহুদীদের 'তৌরাত' (O.T.) কেতাব এবং খ্রীস্টানদের 'ইঞ্জিল' (=NT) কেতাব কোরানে প্রাচীনতর প্রত্যাদেশরূপে স্বীকৃত।

[2]Chosen People and Chosen Ummah (উম্মা মানে ইসলামের প্যান-ইসলামী সংঘশক্তি)।

[3]খাদিজার গর্ভে পয়গম্বরের এক অকালমৃত পুত্রের নাম কাসিম। ইহুদীরা পয়গম্বরকে 'কাসিমের বাপ' বলে সম্বোধন করত। আল্লার বাণী শোনালেন অর্থ—মুসলমান হওয়ার ডাক দিলেন।

[4]তুলনীয় ইকবাল—"হর মুল্‌ক্ মুল্‌ক্-ই মা—অস্ত্ কি মুল্‌ক্-ই-খুদা-ই-মা-অস্ত"। "দুনিয়াটা আমাদের মুসলমানদের কেননা এটা আমাদের খোদার"। ইকবালে বিখ্যাত 'হিন্দুস্তা হামারা' অংশের "হামারা" কথাটার সম্ভবপর মানে হচ্ছে 'হামারা মুসলমানোকা'।

সত্যধর্মসহ রসূল পাঠিয়েছেন"।

সাদা কথায় যুদ্ধ করেই ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হবে। কো ৯|৩৯-এ আছে,

"তোমাদের কী হল যে তোমরা ঘরমনা হয়ে গড়িমসি কর? যদি তোমরা ঘরমনা হয়ে থাক তবে আল্লা অন্য জাতিকে বসিয়ে দেবেন।"

এই যে ভাষা এটা খোলাখুলি সাম্রাজ্যবাদের ভাষা। এ ভাষা আলেকজান্ডার বা নেপোলিয়নও বলতে পারতেন। তফাত এই যে, আলেকজান্ডার বা নেপোলিয়ন শুধু বশ্যতা স্বীকারেই খুশী হতেন; আল্লা ঐটুকুতে খুশী নন। আল্লা সাম্রাজ্যও চান, আর কল্‌মাদীক্ষাও চান। অধ্যাপক অম্লান দত্ত এরকম 'জবরদস্তি কল্‌মাদানের সাম্রাজ্যবাদ'কেই ইসলামের 'সর্বমানবিকতা' বলতে চান।

সর্বমানবিকতা আর দলীয়তা : কিন্তু এখানেই ইসলামী 'সর্বমানবিকতা'র চরিত্রটা সম্পূর্ণ হয়নি। বিধর্মীর উৎসাদন, এবং আগ্রাসী যুদ্ধ চালিয়ে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার ইসলামের দুই প্রধান লক্ষণ বটে কিন্তু এই দুটিই একমাত্র লক্ষণ নয়। কোরানে মুসলিমসংঘকে স্পষ্ট ভাষায় 'আল্লার দল' বলা হয়েছে, এই দৃঢ় বদ্ধমূল দলীয়তা হচ্ছে ইসলামের আর একটা মস্ত লক্ষণ। খবরের কাগজে পড়া গেছে কাশ্মীরে এখন যে মুসলমানরা জেহাদ করছে তাদের একটা দলের নাম 'হিজবুল্লা'। 'হিজ' মানে দল বা পার্টি—'উল্লা' মানে of Allah। সাদা বাংলায় পুরো কথাটা হচ্ছে 'আল্লার পার্টি'। তাছাড়া কোরানেই তা আছে। আল্লা যে দলাদলি করেন একথা অনেকেই মানতে চাইবেন না। কিন্তু এটা কোরানের একটা মূলতত্ত্ব।

কোরানে আল্লার দলকে বলে 'মোমিন' (=বিশ্বাসী=ইসলামে বিশ্বাসী) আর আল্লার বিরুদ্ধ দলকে বলে 'কাফের' (=অবিশ্বাসী=ইসলামে অবিশ্বাসী=বিধর্মী)। আজকাল একটা রটনা চলছে 'কাফের' মানে 'বিধর্মী' নয় 'অমুসলমান' নয়। বলা হচ্ছে 'কাফের' মানে 'পাজী' বা 'বদ্‌মায়েস'। খুব সম্ভব, অধ্যাপক অম্লান দত্তও এই রটনায় বিশ্বাস করেন, কেননা ইসলামের 'সর্বমানবিকতা'র গুণগান করতে গিয়ে তিনি 'কাফের-মোমিন' সংক্রান্ত ইসলামের মূলীভূত দলাদলির চরিত্রটা বোঝার কোনো চেষ্টাই করেননি।

তা যদি তিনি করতেন তো দেখতে পেতেন, 'কাফের' শব্দের মানে কোরানেই খুব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। কোরানের একটা অধ্যায় বা সূরার নামই হচ্ছে 'কাফেরুন'=কাফেরগণ, আল্লা ঐ সূরায় (কো. ১০৮) পয়গম্বরকে আদেশ করছেন :

["হে মহম্মদ, তুমি ডেকে বলে দাও]
ওহে কাফেরগণ।
তোমরা যার উপাসনা কর আমি তার উপাসনা করি না।
তোমরা তার উপাসনা কর না, যার উপাসনা করি আমি।
আমি উপাসনা করব না তার, যার উপাসনা করবে তোমরা।
তোমরা উপাসনা করবে না তার যার উপাসনা করব আমি।
তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম আমার।"

এই সূরার বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার—পয়গম্বর এতে চূড়ান্তভাবে নিজেকে (এবং নিজের অনুগামীদেরকে) উপাস্য-দেবতার মাপকাঠিতে অ-মুসলমানের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। তিনি চূড়ান্তভাবে বুঝিয়ে দেন কাফের কারা। একথা মানতেই হবে 'মোমিন'দের কথা এই সূরায় আলাদা করে উল্লেখ নেই তবে উপাসনার দিক দিয়ে তারা যে কাফেরদের থেকে চূড়ান্তভাবে আলাদা তা এখানে স্পষ্ট। এই সূরা কাফেরুন (কো. ১০৮)-এর বক্তব্যের সঙ্গে সূরা মোমেনুন (কো. ২৩)-এর বক্তব্য মেলালে কাফের-মোমিন তত্ত্বটা পূর্ণাঙ্গ হয়। কিন্তু তার দরকার নেই। কোরানের শত শত

আয়াতে বলা হয়েছে মোমিনরা আল্লার 'নেক বান্দা' বা জান্নাতের সুরপরীর আশ্বাস পাওয়া একটা বিশেষ দল, কাফেররা জাহান্নামের আগুন-ভোজের প্রতিশ্রুতি পাওয়া বিপরীত দল। এই দলাদলি কোরানের মূলসুর। "আল্লা শুধু 'মোমিনদের' রক্ষক, কাফেরের কোনো রক্ষক নেই" (৪৭|১১)। ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্ম আল্লার কাছে গ্রাহ্য নয় (৩|৮৫)। এসব কথা তো কোরানে আছেই, একটা আয়াতে 'আল্লার দল' কথাটাই আছে।

"O believers! Your friend can only be Allah and His messenger, and those who believe who establish worship and pay the poor-due and bow down. And whose taketh [for friend] Allah and His messenger and those who believe, to! The party of Allah they are the victorious" (Koran 5/55-56) [পিক্‌থলের অনুবাদ]

অর্থাৎ 'আল্লার দল' হচ্ছে তারাই যারা বন্ধু বলে মানে আল্লাকে, রসুলকে আর মুসলমানকে। অন্যত্র অমুসলমানকে যেন বন্ধু বলে মানা না হয় (৫/৫১, ৪|১৪৪) এমনকি মরণেও তার জন্য প্রার্থনা করা না হয়(কো ৯|১১৩)—সেকথাও খুব প্রাঞ্জলভাবে বোঝানো হয়েছে। এই যে দলাদলি যা মৃত কাফেরকেও রেহাই দেয় না, অধ্যাপক অম্লান দত্ত ইসলামের 'সর্বমানবিকতা'র ব্যাখ্যায় তার হিসাব নেননি। কিন্তু দলাদলি এবং খুনোখুনি করেই যখন সর্বমানবকে ইসলাম কবুল করাতে হয় যার ফলে ইসলামের 'সর্বমানবিকতা'-তত্ত্ব থেকে এটাকেও বাদ দেওয়া যায় না।

সর্বমানবিকতা ও দীক্ষাদায়ী ধর্ম : ইসলামের এই দলাদলি খুনোখুনির সর্বমানবিকতা নিয়ে অম্লান দত্তের এত উৎসাহের কারণ কী! অনুমান হয় তিনি একটা জনপ্রিয় মিশনারি প্রচারের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন। 'জাতিনির্বিশেষে যে কেউ এই ধর্ম গ্রহণ করতে পারে'—এইটেই তাঁর কাছে সর্বমানবিকতার লক্ষণ। তার এই সরল বিশ্বাসটা সারা পৃথিবী ব্যাপ্ত মিশনারি প্রচারের একটা বাঁধাবুলি। সেন্ট পলের আমল থেকে বলা হয়ে আসছে ইহুদীরা বড় গোঁড়া, তারা বাইরের লোককে ইহুদী ধর্মে নেয় না। ভারতে এসে মিশনারিরা ঠিক এই বুলিটাই 'বলো হরিবোল'-এর ঢঙে প্রচার করতে শুরু করে। তারা বলে, হিন্দুরা বড় গোঁড়া, তারা 'ছুঁয়ো না' 'ছুঁয়ো না' বলে কাউকে কোলে টেনে নেয় না, আমরাই সবাইকে কোলে টানি এবং বুক বাড়িয়ে বুকে চেপে ধরি। অম্লান দত্ত এই তর্কটা মিশনারিদের কাছ থেকেই পেয়েছেন—মুসলমানের কাছ থেকে পাননি। আলবিরুনীর মতো বিদগ্ধ মুসলমানও হিন্দুর ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে কটাক্ষ করতে ভোলেননি, কিন্তু তিনি বেশি নালিশ করেছিলেন হিন্দুরা কেন (মুসলমানের মতো) ধর্ম নিয়ে রক্তারক্তি করে না। অর্থাৎ আলবেরুনীও জানতেন, ইসলামের সর্বমানবিকতা কী বস্তু!

কিন্তু খ্রীস্টানদের দাবিটাই কি সঠিক? বাইবেলে আছে, Who that believeth and is baptised shall be saved. Who that believeth not shall be damned. 'খ্রিস্টানি মতে বিশ্বাসী হয়ে জর্ডনের জলে স্নান করলে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তা নইলে পুড়তে হবে নরকের আগুনে'—এইটি কোনো 'সর্বমানবিকতা'র বুলি নয়। কাফের-মোমিনের মতো ভাগাভাগি খ্রীস্টান-দেরও আছে। 'খ্রীস্টান আর হীদেন' কিংবা 'খ্রীস্টান আর পেগানের' দলাদলি ছাড়া মিশনারিদের 'বাপ্তিজ্‌ম' এগোয় না। অথচ ইহুদী আর হিন্দুর তুলনায় 'সর্বমানবিক'-'সর্বমানবিক' বলে হল্লা-গল্লা করেই খ্রীস্টানরা বাজিমাত করতে চায়। সর্বমানবিকতার বাজি অত সস্তায় মাত হয় কিনা সন্দেহ।

দীক্ষাদায়ী ধর্ম আর দীক্ষাবিরত ধর্ম : অম্লান দত্তের মহাভ্রান্তি এই যে তিনি মিশনারি প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামের মতো উগ্রদীক্ষাদায়ী ধর্মকেও 'সর্বমানবিক' ভেবেছেন এবং ইহুদী (ও হিন্দুর) মতো দীক্ষাবিরত ধর্মকে ভেবেছেন ঔপজাতিক বা জাতীয় সঙ্কীর্ণতাগ্রস্ত। তিনি ভেবে দেখেননি, ইহুদীর "ghetto মনোবৃত্তি" আর হিন্দুর "ছুঁৎমার্গ" নিয়ে খ্রীস্টান মিশনারিরা সারা জগৎ জুড়ে যে প্রচার চালিয়েছে সেটা একেবারেই একতরফা প্রচার; তিনি বোঝেননি টাকাটার একটা উল্টো পিঠ আছে।

তিনি ভেবে দেখেননি ইহুদীর ghetto তার গোঁড়ামি থেকে আসেনি, এসেছে তথাকথিত 'সর্বমানবিক' খ্রীস্টানদের শতাব্দীর পর শতাব্দী নৃশংস, বীভৎস, পাশবিক নিপীড়নের ফলে। হিন্দুর "ছুঁৎমার্গ" তার গোঁড়ামি থেকে আসেনি, এসেছে তুর্কি দস্যুদের হাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী হিন্দুর অন্তঃপুরের সম্ভ্রমনাশের ফলে। হিন্দুর ছুঁৎমার্গর আরম্ভ হিন্দুর আর্যজাতির জাত-বিভাগের শুরু থেকে। দশম-একাদশ শতকে বাঙালি ব্রাহ্মণরা অন্যান্যদের প্রচণ্ড ঘৃণা করতে থাকে। ছোঁয়াছুঁয়ি হিন্দুর ধর্মকর্মে আগে ছিল (সবধর্মেই অল্পবিস্তর থাকে) কিন্তু জ্ঞানমার্গ আর কর্মমার্গের সঙ্গে 'ছুঁৎমার্গ' যোগ হয় তথাকথিত 'সর্বমানবিক' ইসলামের পাশবিক সর্বমানবিকতার সন্ত্রাস থেকেই। অধ্যাপক অম্লান দত্ত যদি 'সেকুলার হিন্দু' না হয়ে ইতিহাসজ্ঞ হিন্দু হতেন তবে তাঁর কাছে ইসলামের সর্বমানবিকতার দাবি উৎকট পরিহাস বলেই প্রতীয়মান হত। কিন্তু না-জেনে না-বুঝে 'সর্বমানবিকতা' নাম দিয়ে 'দীক্ষাদায়ী' ধর্ম আর 'দীক্ষাবিরত ধর্মে'র মধ্যে তিনি যে তফাত করতে চান তা অত্যন্ত অসার। এমনকি দীক্ষাদায়ী ধর্মের মধ্যেও সনাতন ধর্ম-সমবায়ের কোনো ধর্মকে তিনি ধরেননি। তাঁর পণ্ডিতম্মন্য রচনায় বৌদ্ধধর্মের মতো দীক্ষাদায়ী ধর্মের কোনো উল্লেখ নেই। জিনিসটা ভেবে দেখবার মতো।

উদার মানবিকতা সনাতন ধর্মেরই লক্ষণ : ভেবে দেখলে বোঝা যায় দীক্ষাদায়ী হোক, দীক্ষাবিরত হোক, কোনো একেশ্বরবাদী ধর্মেই সর্বমানবিকতা থাকতে পারে না, কেননা একেশ্বরের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অন্যদেবতাবিদ্বেষ—তার ফলে দলাদলি-খুনোখুনি যে-কোনো একেশ্বরবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অন্য দেবতা পূজার খ্রীস্টান নাম হচ্ছে Idolatry, ইসলামী নাম হচ্ছে শির্ক—দুটি শব্দই প্রচণ্ডতম ঘৃণার অভিব্যক্তি। এই ঘৃণার জন্মদাতা অবশ্য মুসা (Moses)—কিন্তু ইহুদীরা কোনো 'কল্‌মা' বা 'বাপ্তিস্মের' ধার ধারত না বলে তারা সারা পৃথিবীকে শুধু Jew আর Gentile-এ ভাগাভাগি করেই ক্ষান্ত হয়েছে—প্যালেস্টাইনের বাইরে গিয়ে Gentile-দের 'বাপ্তিস্ম' গেলানোর জন্য তৎপর হয়নি। খ্রীস্টানের 'বাপ্তিস্ম' কনস্ট্যানটাইনের সময় থেকেই নখদন্ত নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে—এখনো এশিয়া-আফ্রিকায় প্রতারণা, ঘুষ আর অর্থবলের সাহায্যে মিশনারির দল 'বাপ্তিস্ম' বিতরণে নিদ্রাহীন। ইসলামের 'কল্‌মা' বিতরণ কোনো কনস্ট্যানটাইনেরও অপেক্ষা করেনি, আদিযুগ থেকেই সে কল্‌মা বিলিয়েছে জেহাদ করে। গণহত্যা, গণধর্মান্তর, গণজিজিয়া এবং গণলুণ্ঠনের 'সর্বমানবিকতাই' সে জানে—আজ পর্যন্ত এই নিয়মের অন্যথা হয়নি। এই ইসলামকে অম্লান দত্ত 'সর্বমানবিকতা'র তাম্রপত্র দেবার জন্য কলম ধরেছেন—কিন্তু সনাতন ধর্মের জন্য মার্জিত কটুভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা তাঁর কলম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়নি।

যে ইসলাম অন্য দেবতা-বিদ্বেষী একেশ্বরের নামে দলাদলি ও খুনোখুনি করে তার সমগ্র ইতিহাসকে রক্তাক্ত করেছে, আধুনিক ভারতের বুকেও সে তার সপ্তম শতাব্দীর নখদন্তময় মূর্তি নিয়ে নূতন করে আত্মপ্রকাশ করতে যত্নবান। এই ইসলামকে অম্লান দত্তের মতো 'সেকুলার হিন্দু' এই মহা দুর্যোগের দিনে 'সর্বমানবিক' বলে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য কোমর বেঁধেছেন। অথচ যে সনাতনধর্ম বলে 'ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান', যে বলে 'মা হিংসীঃ সর্বভূতানি' তার জন্য তাঁর কোনো সমবেদনা নেই। ঘাতক ধর্মের (তুর্কি) সন্ত্রাসের দিনে সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শী হিন্দু যে নিরুপায়ের ছুঁতমার্গ আশ্রয় করে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল এবং যে ছুঁৎমার্গকে সে এযুগে বিদায় করবার জন্য আন্তরিক চেষ্টায় চেষ্টান্বিত, সেই আপদ্ধর্মের বিরুদ্ধে তিনি রক্তচক্ষু[5] দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, ওটাকেই তিনি ইসলামের ডবল সাফাই হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর মতে ইসলাম শুধু 'সর্বমানবিক ধর্ম' নয়, ছুঁৎমার্গী হিন্দুর তুলনায় 'সামাজিক সাম্যের'ও পরাকাষ্ঠা। পরের পরিচ্ছেদে ইসলামের এই 'সামাজিক সাম্যের' কিছু পরিচয় দেওয়া যাবে।

---

[5]আগেই বলেছি অম্লান দত্তের 'জোবান' 'বদ্‌জোবান' নয়—তাঁর ভাষা পাদ্রীসাহেবের ভাষা। কাজেই 'রক্তচক্ষু' কথাটা তাঁর সম্বন্ধে শোভন নয়। তিনি হিন্দুসমাজকে 'পাদ্রীচক্ষু' দেখিয়েছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলাম কি সামাজিক সাম্যের ধর্ম?

ইসলামকে সামাজিক সাম্যের বার্তাবহ বানিয়ে অম্লান দত্ত যে মানপত্র দিয়েছেন তাতেই তাঁর হিন্দু বিদ্বেষ বড় তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে—যদিও তাঁর 'জোবানটা' 'বদ্‌জোবান' নয়—'পাদ্রীসাহেবের জোবান'। অম্লান দত্ত বলেন :

'হিন্দুসমাজে অসাম্য যেমন শাস্ত্রীয় অনুমোদন লাভ করেছে, দৃঢ় আচারের দ্বারা উচ্চনীচ ভেদাভেদ সুরক্ষিত হয়েছে, মুসলমান সমাজে তেমন হয়নি।'

পাঠককে এই মান্য অধ্যাপকের সর্বজ্ঞ ও মহানীতিজ্ঞের ঢংটা লক্ষ্য করতে বলি। অম্লান দত্ত দৃপ্তস্বরে বলতে চান, হিন্দুশাস্ত্রে বৈষম্য আছে, হিন্দুর আচার ব্যবহারে বৈষম্য আছে। কথাটা এতই সোজা ও সর্ববাদিসম্মত যে এমন করে মঞ্চারূঢ়ের ভঙ্গিতে বলার দরকার করে না। খুব কম হিন্দুই এযুগে ঐ বৈষম্যের পক্ষ সমর্থন করে, খুব কম হিন্দুই ঐ সমস্ত শাস্ত্রীয় বৈষম্য তথা আচার-বিচারের বৈষম্য থেকে মুক্তি পেতে অনিচ্ছা দেখায়। অর্থাৎ এই সোজা কথাটা আজকের দিনে টঙে চড়ে না বললেও চলত। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা অম্লান দত্ত যে সবজান্তার ভঙ্গিতে দৃপ্তস্বরে জানিয়ে দিয়েছেন, "ইসলামে ওগুলি নেই" হিন্দুর ধর্ম ও ইসলাম সম্বন্ধে অতখানি জ্ঞান কি তাঁর আছে? তিনি যুক্তি তো দিয়েছেন এইটুকু যে, পয়গম্বর একবার মুসলিম দাসকে মুসলিম মনিবের সমান খাদ্যবস্তু জোগাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক হাদিসটা তিনি (সূত্র উল্লেখ করে) তুলে ধরেননি, কিন্তু সে কথা থাক। তাঁর খ্যাতির দিকে তাকিয়ে তাঁর এই অপ্রামাণিক উল্লেখকেই আমরা প্রামাণিক বলে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তিনি কি তলিয়ে দেখেছেন, পয়গম্বরের ঐ নির্দেশের বৈধানিক গুরুত্ব কতটা? তিনি কি দাসপ্রথা সম্বন্ধে কোরান বাণী, পয়গম্বর বাণী এবং পয়গম্বরের দিনানুদৈনিক আচরণ বিধির সঙ্গে ইসলামী দাসপ্রথার কার্যগত রূপ মিলিয়ে দেখেছেন? তা যদি তিনি দেখতেন তবে হিন্দুসমাজের বৈষম্যের তীব্রতা বোঝাবার জন্য ভুলেও ইসলামের নাম নিতেন না। সেক্ষেত্রে তিনি স্তব্ধ হয়ে দেখতে পেতেন, ইসলাম যে সামাজিক বৈষম্যের জন্ম দিয়েছে তার কাছে হিন্দু সমাজের বৈষম্য ছেলেখেলা।

ইসলামের সামাজিক বৈষম্য : মুসলমান সমাজ মূলত দাসপ্রভুর সমাজ—দাসপ্রথা ঐ সমাজে এতই বদ্ধমূল যে মুসলমানদের সবচেয়ে সুলভ নাম হচ্ছে 'আব্দুল'—'আব্দুল' মানে (ওমুকের) 'দাস'। পয়গম্বরের ঠাকুদ্দার নাম ছিল 'আব্দুল মোতালেব'—কথাটার আক্ষরিক মানে 'মোতালেব নামধারী ব্যক্তিবিশেষের দাস'। 'আব্দুল মোতালেব' অবশ্য মুসলমান ছিলেন না, তিনি কোন্ 'মোতালেবের' ক্রীতদাস ছিলেন সেকথাও ইতিহাসে লেখা নেই। কিন্তু ইসলামে ঐ নামকরণ পদ্ধতি বজায় রেখে এইটুকু শুধু তফাত করা হয় যে 'ওমুকের দাস' কথাটাতে 'ওমুকের' জায়গায় আল্লার কোনো একটা নাম জুড়ে দেওয়া হয়। ব্যাপারটার তাৎপর্য অতি গভীর—'আল্লার দাস' নামকরণের দ্বারা মানবেতিহাসের সবচেয়ে বর্বর প্রথাটাকে একধরনের গৌরব দান করা হয়। কিন্তু তলিয়ে

দেখলে বোঝা যায়, পূতিগন্ধময় শবকে ফুল-বেলপাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়ার গৌরবের চেয়ে ঐ গৌরবের দাম বেশি নয়।

কেননা দাসপ্রথার সঙ্গে ইসলাম এমন এক দাসীপ্রথাকেও জুড়ে দেয়—যা এ যুগের ইসলামেও ক্ষণে ক্ষণে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। কোরানের একেবারে প্রারম্ভিক যুগেই বিধান দেওয়া হয়, দাসীকে ভোগ করা মুসলমানের সুলভতম হক্কের পাওনা (কো ৭০/২৯-৩০, কো ২৩/১-৭)। শুধু তাই নয়—'মোমিন' বা ইসলামনিষ্ঠ মুসলমানের চরিত্র-লক্ষণের মধ্যেও ওটাকে জুড়ে দেওয়া হয়। কোরানের ২৩নং সূরায় আরম্ভেই পরিষ্কার বলা হয় : (১) নামাজে বিনম্রতা, (২) অনর্থক বাক্যব্যয়ে বিমুখতা, (৩) জাকাত-কর দানে তৎপরতা এবং (৪)'পত্নীবর্গ এবং দাসী পত্নীবর্গ সংক্রান্ত অনিন্দনীয় ইন্দ্রিয়সেবার বাইরে জিতিন্দ্রিয়তা'ই আদর্শ মোমিনের লক্ষণ। ইসলাম-প্রেমী সেকুলার হিন্দুকে এই তত্ত্বটা ঢেঁকুর তুলে পরিপাক করতে অনুরোধ জানাই[6]।

এও লক্ষ্য করতে অনুরোধ জানাই, হিন্দুবংশজাত ভারতীয় মুসলমান এই 'মোমিন' লক্ষণ থেকে যত দূরেই থাক, পয়গম্বরের আপন দেশের 'মোমিন'রা আজো দাসীভোগের অভ্যাস ছাড়তে পারেনি। তারা আজো এই ভারতভূমিতে এসেই তাদের হক্কের পাওনা সংগ্রহে তৎপর থাকে। আমিনা প্রভৃতি হতভাগিনীর কথা হয়তো অম্লান দত্তের মনে পড়বে এবং যখন তিনি খোঁজ নিয়ে জানবেন, হায়দ্রাবাদের মুসলিম মহল্লার অলিতে-গলিতে এরকম দাসীর ব্যবসায় আজো রমরমিয়ে চলে তখন হয়তো তিনি হিন্দুসমাজের বৈষম্য দেখাতে গিয়ে ইসলামের নাম করতে লজ্জা পাবেন। তিনি হঠাৎ বুঝতে পারবেন, হায়দ্রাবাদের কথা বাদ দিলে ভারতীয় ইসলামে এই বর্বরতার অপ্রাচুর্য পুরোপুরি হিন্দুপ্রভাবের ফল—নিজের তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের এই বিষম পরিণতি দেখে তিনি হয়তো ভির্মি খাবেন। ['সেকুলার হিন্দু' কোনো যুক্তিকেই ভির্মি খায় না—সেকথা স্বতন্ত্র]

কোরানে দাসপ্রথার জড়

এই দাসপ্রথার জড় আছে কোরানেই—বস্তুতঃ মানুষে মানুষে, মুসলমানে-মুসলমানে এবং মুসলমানে-অমুসলমানে কোরান যে সামাজিক সম্বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে তার সবচেয়ে বড় সম্বন্ধ হচ্ছে দাসপ্রভুর সম্বন্ধ। 'মনিবরা যেন, দাসকে সমান খেতে পরতে দেয়'—পয়গম্বরের এই উক্তি নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়। কিন্তু যে-কোরানবাণীকে নরম করবার জন্য পয়গম্বর এই প্রশংসনীয় বাণী উচ্চারণ করেন এখানে তার আক্ষরিক ইংরেজি রূপটা স্মরণ করা যাক। আল্লা বলেন,

And Allah hath favoured some of you above others in provision. Now those who are more favoured will by no means hand over their provisions to those (slaves) whom their right hand possesses, so that they may be equal with them in respect thereof; Is it then the grace of Allah that they deny?" (K 16/71 মহম্মদ পিক্টহলের অনুবাদ)।

["আল্লা, তোমাদের কাউকে-কাউকে খাদ্যবস্ত্রের দিক দিয়ে বেশি অনুগ্রহ করেছেন। যারা বেশি অনুগ্রহ পেয়েছে তারা সেই রসদ তাদের ডান-হাতে পাওয়া দাস-দাসীদের দেয় না, কেননা তারা তাতে অশন-বসনে মনিবদের সমান হয়ে যাবে। আল্লার এই অনুগ্রহ কি তারা (=মনিবরা) অস্বীকার করে?"]

অধ্যাপক অম্লান দত্তের মতো ইসলামপ্রেমী সেকুলার পণ্ডিতদেরকে এই আয়াতটা একটু গভী-

[6]কো ৪।৩ আয়াতকে 'বহুবিবাহের আয়াত' বলা হয়। এতেও লেখা আছে : 'বিয়ে করবে যাদের ভালো লাগে—দুজনকে বা তিনজনকে বা চারজনকে। সুবিচার না করতে পারলে একজনকে অথবা ডান-হাতে পাওয়া দাসীগণকে।

রভাবে ভেবে দেখতে বলি। কোরান পরিষ্কার বলছে, আল্লাই দাসপ্রভুর বৈষম্য সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লার দয়াতেই মনিবরা দাসেদের মালিকানা পেয়েছে ডানহাতে। কোরান প্রশ্ন করছে : আল্লার অতবড় অনুগ্রহ কি মনিবরা মানবে না?—অথচ অম্লান দত্ত দৃঢ়স্বরে বলেন 'সামাজিক বৈষম্য' ব্যাপারটা ইসলামে (হিন্দু সমাজের মতো) শাস্ত্রীয় অনুমোদন পায়নি, 'দৃঢ় আচারের দ্বারা উচ্চনীচ ভেদাভেদ'(ইসলামে) সুরক্ষিত হয়নি। অধ্যাপক অম্লান দত্ত কোরান-হাদিস এবং ইসলামি আইন বিধির কেতাবগুলি একেবারে গুলে খেয়েছেন বলেই অনুমান হয়[7]।

কোরানে দাসী প্রথার জড় : কোরানে এই যে আল্লার দেওয়া দাসপ্রথার অনুগ্রহলিপি, এর মধ্যে দাসীপ্রথার কথাটা উহ্য আছে। কিন্তু কোরান ওটা উহ্য উক্তির অস্পষ্টতার মধ্যে রাখেনি—দাসী-সম্বন্ধীয় একটা বিশেষ বিধান বড় মারাত্মকভাবেই খোলসা করে বলেছে। বলবারই কথা, কেননা দাসকে শুধু খাটানো যায় বা বিক্রি করে টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু দাসীকে (অধিকন্তু) দৈহিক সম্ভোগের সম্পদ হিসাবেও ব্যবহার করা যায়। মুসলমানরা ওরকম ব্যবহার করতে পারবে কিনা এ প্রশ্নের উত্তর কোরান খুব স্পষ্ট করে বলে দেবার দরকার বোধ করেছে। বস্তুতঃ দাসপ্রথা সম্বন্ধে এইটেই কোরানের সবচেয়ে পুনরুক্তিবহুল বিধান, দাসী সম্বন্ধে সে যত স্পষ্টবাদী দাস-সম্বন্ধে তত নয়। এ সম্বন্ধে দুটি মাত্র আয়াত উদ্ধৃত করি। ২৪/৪ আয়াতে কোরান বলেছে :

'সধবা নারী অবৈধ কিন্তু তোমাদিগের দক্ষিণ হস্ত যাহাদিগের উপর অধিকার স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগের সম্বন্ধে আল্লা লিপি করিয়াছেন' [গিরিশ সেনের অনুবাদ] "And all married women (are forbidden unto you) save those (captives) whom your right hands possess. This is a decree of Allah for you" [পিক্টহলের অনুবাদ] অর্থাৎ দাসী সধবা হোক কুমারী হোক তাদের অবাধে ভোগ করা যাবে, —এবং এটা কোনো আব্দুল মকবুলের বিধান নয়, খোদ আল্লাতালার বিধান। সামাজিক সাম্যই বটে।

আরেকটা আয়াত উদ্ধৃত করি। পাছে কেউ ভাবে, আল্লা সাধারণ মুসলমানের জন্য ঐরকম একটা সামান্য বিধান দিয়েই ক্ষান্ত থেকেছেন, কিন্তু পয়গম্বরকে এরকম বিধানে আবদ্ধ করেননি, তার জন্যও আল্লার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ দাসীসম্ভোগ মুসলমানের পক্ষে একটা পরম আদর্শ, ওটা যেমন-তেমন ব্যবস্থা নয়। ৩৩ নং সূরায় খোদ পয়গম্বরের দাসীঘটিত অধিকার নিয়ে অনেকগুলি আয়াত আছে। ৩৩/৫০-এ লেখা আছে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পয়গম্বর যত খুশী বৈধ পত্নী রাখতে পারেন, দাসীপত্নী তো বটেই। ৩৩/৫২-তে বলা হয়েছে বৈধ-পত্নীর ব্যবস্থা শেষ হয়ে যাবার পরেও, 'ডান-হাতে পাওয়া' দাসীর ব্যবস্থাটা, তাঁর জন্য বজায় থাকবে :

"It is not allowed thee to take (other) women henceforth, nor that thou shouldst change them for other wives even though their beauty pleased thee, save those whom thy right hand possesseth. And Allah is watcher over all things" [পিক্টহলের অনুবাদ]—অর্থাৎ পয়গম্বরের জন্য দাসীপত্নীর ব্যবস্থা অফুরন্ত ও অনিঃশেষ।[8]

দাসদাসী সম্বন্ধে একটা কথা বলেই এই অনুচ্ছেদটা শেষ করব। ইসলামের এই সমস্ত বিধান আজ পর্যন্ত পরিত্যক্ত হয়নি, মাদ্রাসা-মক্তবে এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সশ্রদ্ধ অনুশীলন আজো বর্জিত হয়নি, একজন মুসলমান বিদ্বানও এই সমস্ত বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাননি। ভারতে এই

[7]'দৃঢ় আচারের দ্বারা উচ্চনীচ ভেদাভেদ' সম্বন্ধে শুধু Dictionary of Islam-এর লেখক T. P. Hughes-এর উক্তি উদ্ধৃত করব। "The slavery of Islam is interwoven with the law of marriage, the law of sale and the Law of inheritance, of the systein, and its abolition would strike at the very foundation of the code of Muhammadanism" (Hughes page 600.)

[8]পয়গম্বর অবশ্য দুয়ের বেশি দাসীপত্নী গ্রহণ করেননি—কিন্তু সেটা তাঁর মহত্ত্ব। আমাদের বিবেচ্য ইসলামী দাসী-পত্নীর 'শাস্ত্রীয় অনুমোদন'।

প্রথা নিষিদ্ধ হয় ইংরাজের বিধানে—অর্থাৎ আল্লার বিধানে নয়। তুর্কিসাম্রাজ্যে এই প্রথানিষিদ্ধ হয় ইংরেজের চাপে অর্থাৎ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পরে(১৮৫৫-৫৬)। কিন্তু খোদ আরবভূমি তুর্কিসুলতানের ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, খলিফা তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। ইদানীং কালে আরবভূমিতেও প্রকাশ্যে দাসদাসী বিক্রি হয় না, কিন্তু ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার প্রায় বিশ লাখ মেয়ে আরব শেখদের ভোগদখলে বাস করে। তারা যে ইসলামের 'সামাজিক সাম্যের' দৃষ্টান্ত হিসাবেই বাস করে, অধ্যাপক অম্লান দত্তের খাতিরে সে কথা আমাদের মানতেই হবে। কিন্তু তাঁর খাতিরেও আমরা একথা মানতে পারি না যে, হিন্দুসমাজে যে অসাম্য 'শাস্ত্রিক অনুমোদন পেয়েছে', এবং 'দৃঢ় আচারের দ্বারা সুরক্ষিত' হয়েছে ইসলামে তেমন কিছু নেই।

কোরেশ-অকোরেশ, আরব-আজম, আশ্‌রফ-আজ্‌লফ : বস্তুতঃ দাসপ্রভুর বৈষম্য ইসলামী সমাজের চরম ও পরম জিনিস। কিন্তু কেউ যদি ভাবেন, দাসকুলের বাইরেকার মুসলমানরাই 'সামাজিক সাম্যের' ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান, তবে তিনি খুব ভুল করবেন। আগের পরিচ্ছেদে বলেছি, কোরান-হাদিসের মতে সারা দুনিয়া হচ্ছে 'মুসলমান' নামক আল্লার চাপরাস পাওয়া মোমিন মহাপুরুষদের mandated territory। কিন্তু এও বলতে হবে, আল্লার ঐ 'নেক বান্দা'দের মধ্যে একটু বেশি নেকনজর পাওয়া গোষ্ঠী হচ্ছে কোরেশ গোষ্ঠী যে গোষ্ঠীর মধ্যে খোদ পয়গম্বরের আবির্ভাব ঘটে। কোরানের দুটো প্রথম যুগের সূরাতেই আল্লার বিশেষ অনুগ্রহভাজন গোষ্ঠী হিসাবে এই গোষ্ঠীর গুণগান করা হয়েছে।

সূরা ফিল□এতে বলা হয়েছে পয়গম্বরের জন্মের বৎসরে আল্লা পাখীদের মুখ দিয়ে পাথরের কুচি মেরে মেরে কোরেশ জাতির হাবশী শত্রুদেরকে খতম করেন এবং অলৌকিকভাবে মক্কার স্বাধীনতা বজায় রাখেন।

সূরা কোরেশ□এতে বলা হয়েছে, আল্লাই কোরেশদের তেজীয়ান করেন এবং দিকে দিকে ও শীতে গ্রীষ্মে তাদের সার্থবাহ পাঠিয়ে তাদের ধনসম্পদ জোগান।

কিন্তু এমন যে বিশেষ অনুগ্রহভাজন কোরেশ গোষ্ঠী, তাদের সঙ্গে অন্য মুসলমানের চরম বৈষম্যের কথা কোরানে নেই, আছে হদিসে। প্রামাণিক হাদিসে লেখা আছে :

People are subservient to the Quraish. The Muslims among them being subservient to the Muslims among [the Quraish] and the disbelievers among them being subservient to the disbelievers among [the Quraish] [Sahi Muslim No. 44731]

এই হাদিসের অর্থ অত্যন্ত প্রাঞ্জল। সমস্ত মানবজাতিই কোরেশদের তাঁবেদার—যারা মুসলমান তারা মুসলমান কোরেশের তাঁবেদার আর যারা কাফের তারা কাফের কোরেশের তাঁবেদার।—এই হাদিসটাকে ইসলামী সামাজিক সাম্যের magna carta বললে অন্যায় হয় না।

পয়গম্বরের এই হাদিসটাকে একটু খুঁটিয়ে দেখলে একটা চমকপ্রদ তত্ত্ব পাওয়া যায়। সব মুসলমানই অন্য মুসলমানের 'ভাই' বটে কিন্তু কোরেশরা হচ্ছে 'বড় ভাই'। এই সঙ্গে যোগ করা উচিত : সৈয়দরা হচ্ছে আরো বড় ভাই কেননা তারা শুধু কোরেশ নয়, তারা খোদ পয়গম্বরের বংশজাত কোরেশ। পাঠক শুনে বিস্মিত হবেন না, আরবী 'সৈয়দ' কথাটার আক্ষরিক অর্থই হচ্ছে 'প্রভু' বা master। ইসলামের 'সামাজিক সাম্য' এইরকম।

আরেকটা হাদিসের কথা বলি। পয়গম্বর স্পষ্টবাক্যে বিধান দিয়ে গেছেন—খলিফার পদ কখনো কোরেশ জাতের বাইরে যেতে পারবে না। শিয়ারা আরেক ধাপ এগিয়ে বলে—শুধু কোরেশ হলেই চলবে না, সৈয়দ কোরেশ না হলে খলিফা হবে না। আশ্চর্য নয় যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজরা এই মহাসাম্যবাদের কল্যাণেই আরবদের খেপিয়ে দিয়ে অটোমানদের তুর্কি খিলাফতটা ধ্বংসপুরে

পাঠিয়ে দেয়।

বস্তুতঃ ইসলামের সামাজিক বৈষম্য যে কী ভয়ানক, এদেশের সেকুলার মীডিয়াতে 'ব্রাদারহুড অব ইসলামের' গগনভেদী চিৎকারের চোটে তা অনেকেই বোঝেন না। মনে করুন, কোরেশরাও যেমন আরব, বেদুইনরা তার চেয়ে কম আরব নয়। কিন্তু কোরেশের মেয়ে বেদুইনের ঘরে যাবে এমনধারা প্রস্তাব উঠলে রক্তারক্তি বেধে যায়। সাদা আরবের নিগ্রোদাসীর গর্ভজাত কালাআরবের অবস্থা আরো ভয়ানক। এই কালা আরবেরাই দাসীপত্নী সংগ্রহের জন্য হায়দ্রাবাদের বাঁদিহাটে তাল্লাসি করে বেড়ায়—খাঁটি আরব মেয়েকে বৌ-হিসাবে পাওয়া তার অসাধ্য। অধ্যাপক অম্লান দত্তের মতো ইসলামী সাম্যবাদের গুণমুগ্ধ লেখকরা এসব খবর জানেন না।

এও হয়তো তাঁরা জানেন না যে, পয়গম্বর-স্বীকৃত এই কোরেশ-অকোরেশের ভেদাভেদ খলিফাদের আমলেই আরব-আজমের (=অনারব) ভেদাভেদে রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো খলিফা আজম(=অনারব) মুসলমানদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করতেন। অর্থাৎ অনারব মুসলমান তাঁদের কাছে কাফেরের নামান্তর বলে গণ্য ছিল। ভারতের হিন্দুবংশজাত মুসলমানরাও তুর্কি-বিজেতাদের কাছে কাফেরের বেশি মর্যাদা পায়নি। তুর্কিজন্মগর্বিত জিয়াউদ্দীন বারানী ভারতীয় মুসলমানদের বলতেন low born bazaarpeople অর্থাৎ কিনা অন্ত্যজ জাতি। ঐ সময় আশ্‌রফ-আজ্‌লফের ভেদাভেদটাও পাকা হয়। আশরফ মানে সম্ভ্রান্ত, এদের কেউ শেখ, কেউ সৈয়দ, কেউ বা মোগল, কেউ বা পাঠান অর্থাৎ এরাও সামাজিক সাম্যের আলো পাওয়া একটা একীভূত গোষ্ঠী নয়। কিন্তু আজ্‌লফ বা বাজে লোকদের সঙ্গে অর্থাৎ হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানের সঙ্গে, এদের তফাত মনিবের সঙ্গে গোলামের তফাতের চেয়ে কম নয়।

এই আজ্‌লফদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য হচ্ছে বাঙালী মুসলমানের দল। আমি শেখ-সুফী-বংশ-গর্বিত বাঙালী মুসলমানকে বিলাপ করতে শুনেছি, অবাঙালী মুসলমান আমাদের মুসলমান বলেই মানে না। '৭১ সালে এই বৈষম্যের চরম মূর্তি দেখা যায় পূর্ববঙ্গে। পাঞ্জাবী মুসলমান সেদিন কাফের হিন্দু আর বাঙালী মুসলমানকে এক গোয়ালের গোরু বানিয়ে লাখে-লাখে জবাই করে। হিন্দুর মেয়ে আর মুসলমান মেয়েকে তারা সমভাবে বাঙ্কারে টেনে নিয়ে গিয়ে 'ইসলামী সর্বমানবিকতা' আর 'ইসলামী সাম্যবাদের' হদ্দমদ্দ করে। বাঙালী মুসলমান ঐ সময় 'ব্রাদারহুড অব ইসলামে'র বুলিটা কিছুদিনের জন্য ত্যাগ করেছিল কিন্তু অধ্যাপক অম্লান দত্তের মতো 'সেকুলার হিন্দু'রা তখনো এ বুলি ছাড়েননি, এখনও ছাড়ছেন না। সন্দেহ হয় 'ব্রাদারহুড অব ইসলামে'র খবর বোধহয় কেবলমাত্র 'সেকুলার হিন্দুরাই' জানে। ওটা আল্লাও জানতেন না, পয়গম্বরও নয়।

কোরানে ভাই-ভাই তত্ত্বের পরিণতি : একথা অবশ্যই স্বীকার্য কোরান-হাদিসে অনেক জায়গায় বলা হয়েছে "মুসলমান যেন মুসলমানের রক্তপাত না করে কেননা তারা ভাই-ভাই"। কোরানে ৪৯/৯-১০ আয়াতে এই কথাটা স্পষ্ট করে বলা আছে—কিন্তু এটা যে সামাজিক সাম্যের বাণী নয় সেকথা বলাই বাহুল্য। 'মুসলমান-মুসলমানের রক্তপাত করবে না' একথার মানে এমন নয় যে, গোলাম-মুসলমানের গোলামি তুলে দিয়ে মনিবের সমান সামাজিক মর্যাদা দিতে হবে; এমনও নয় যে কোরেশ-অকোরেশ সমান সামাজিক মর্যাদা পাবে; এমনও নয় যে, সৈয়দ মুসলমান 'জোলা' মুসলমানকে কন্যাদান করবে। কথাটার সোজা মানে হচ্ছে, মুসলমানকে মুসলমানের রক্তপাত না করে কাফেরের রক্তপাত করবার জন্যই তৎপর হতে হবে। ইসলামের শাস্ত্রে ও ইতিহাসে এর বেশি ভ্রাতৃত্বের কথা কোনো কালেই শোনা যায়নি বরং কোরানে যেভাবে মক্কা থেকে পালিয়ে আসা মোহাজির মুসলমান এবং মদিনাবাসী 'আনসার' মুসলমানের ক্ষণস্থায়ী ভ্রাতৃত্বকে নাকচ করা হয় তার খবর নিলে সেকুলার হিন্দুর চোখও কপালে উঠে যেতে পারে।

সূরা আহজাব নামে কোরানে একটা বিখ্যাত অধ্যায় আছে—প্রচলিত কোরানে এর নম্বর হচ্ছে ৩৩। অধ্যায়টার বিষয়বস্তু হচ্ছে পোষ্যপুত্রের বৌকে বিয়ে করার ব্যাপারে প্রাক্-ইসলামী নিষেধের

অপনোদন এবং খোদ পয়গম্বরকে দিয়েই এ ব্যাপারে একটা 'সুন্না' বা আদর্শের সৃষ্টি[9]। কিন্তু ঐ সূরায় আল্লা শুধু পোষ্যপুত্র সংক্রান্ত 'কুসংস্কার' নাশ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি সমস্ত পাতানো সম্পর্ককেই তুলে দেবার হুকুম দেন। ইতিপূর্বে পয়গম্বর মদিনায় এসে এক-এক জন মোহাজিরের সঙ্গে একেকজন 'আনসারের' 'ব্রাদারহুডের' পত্তন করেন। আল্লা এই সূরায় পরিষ্কার বিধান দিলেন, পাতানো ভ্রাতৃত্বের চেয়ে নিকটতর সম্পর্ক হচ্ছে রক্তের সম্পর্ক। "The owners of kinship are closer one to another in the ordinance of Allah than (other) believers and fugitives who fled from Mecca" (K 33/6)। অধ্যাপক অম্লান দত্তের মতো 'সেকুলার হিন্দুরা' ইসলামী-ব্রাদারহুডের এই পরিণতির কথাটা ভেবে দেখতে পারেন। আল্লা ধর্মসম্পর্কের চেয়ে রক্তের সম্পর্ককে বড় স্থান দেননি, কিন্তু ধর্মের মিল থাকলে পর রক্তের সম্পর্ককে করেছিলেন মানব-সম্পর্কের চেয়ে বড়। অধ্যাপক অম্লান দত্তের মতো 'মানববাদী' সেকিউলারিস্টরা কি এতে রাজি হবেন?

ব্রাদারহুড অব্ ইসলামের বুলিটা কার?

ইসলামে কাফের মারার 'ব্রাদারহুড' ছাড়া আর কোনো 'ব্রাদারহুড' নেই। সামাজিক সাম্যের 'ব্রাদারহুডের' কল্পনা কোরান-হাদিসের প্রণেতারা কোনো কালেই করেননি—আর্থিক সাম্য বা না-গরিক অধিকারের সাম্য তো অনেক দূরের কথা। অনেকে বলেন ইসলামে ভ্রাতৃত্ব আছে বলেই জাতিবিভক্ত হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান হতে শুরু করে—কিন্তু একথার কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই, এই মিথ্যা প্রচার সম্বন্ধে একটা কথা বলব।

এ সম্বন্ধে সন্দেহের স্থান অল্পই যে, খ্রীস্টান মিশনারিরাই ভারতে এসে এই প্রচারটা শুরু করেন। তার কারণ হিন্দুর জাতিবিভাগকে 'জাতিভেদ' হিসাবে ঘৃণিত দেখিয়ে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুগণকে খ্রীস্টানির কোলে টানাই তাঁদের কাছে চরম ও পরম মতলব হিসাবে স্বীকৃত ছিল। মুসলমানকে কখনো খ্রীস্টানিতে টানা যাবে না বরং তাতে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড হবে, এ তাঁরা জানতেন। কিন্তু হিন্দুর জাতিভেদকে ঘৃণিত দেখাতে গিয়ে ইসলামী 'ব্রাদারহুডে'র আজগুবি কল্পনাটা তাঁরা সত্যের মতো দিগ্‌বিদিকে ছড়িয়ে দিলেন কেন? তার কারণ একেশ্বরবাদী এবং দীক্ষাদায়ী ধর্ম হিসাবে ইসলামের সঙ্গে তাঁদের নিজেদের রক্তাক্ত ইতিহাসের আশ্চর্য মিল তাঁরা (দুদিক থেকেই) টের পেয়েছিলেন। কাজেই 'ব্রাদারহুড অব ক্রিশ্চিয়ানিটি'র সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রাদারহুড অব্ ইসলাম' প্রচার না করে তাঁদের উপায় ছিল না। 'কল্‌মা'র রক্তাক্ত মূর্তি দেখাতে গেলে 'বাপ্তিস্মের' রক্তস্রাবও 'হীদেনে'র কাছে প্রকট হয়ে যাবে এই ভয়টি তাঁরা করেছিলেন[10]।

আশ্চর্য নয় যে ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও এই প্রচারে যোগ দিতে কামাই করেননি। এই পণ্ডিতরা বেশ জানতেন, মুসলমানের লেখা ইতিহাসে জবরদস্তি কল্‌মাদান এবং খঞ্জরের মুখে কল্‌মাদানের কথাই সবিস্তারে লেখা আছে। কিন্তু বাংলার মতো প্রত্যন্ত প্রদেশের কল্‌মা লাভের বিবরণ সম্বন্ধে ফার্সি ইতিহাসের বর্ণনা সুপ্রচুর নয়। কাজেই 'ব্রাদারহুড অব ইসলামের' টানেই হাজার হাজার বাঙালী হিন্দু মুসলমান হয়েছে—মিশনারিদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে এটুকু ঐতিহাসিক অনুমান তাঁরা অকুতোভয়েই করেছিলেন। ইসলামী ভাই-ভাই-এর আজগুবি কথাটা আসে এই দুটি সূত্র থেকেই, ইসলামের তত্ত্বে বা ইতিহাসে এর লেশমাত্র সমর্থনও নেই। অম্লান দত্তের মতো 'সেকুলার হিন্দু'রাও

[9]তিনি পোষ্যপুত্র জায়েদের পত্নীকে (তালাকের পর) নিজের পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

[10]এর মধ্যে আরো অনেক কথা আছে। খ্রীস্টানের কাছে হিন্দু ধর্ম সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত; ইসলাম ঘৃণিত হলেও হিন্দুর মত ঘৃণিত নয়। এর ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক কারণ এখানে বিচার্য নয়।

এই দুটি সূত্র থেকেই ইসলামের সাম্যের তত্ত্ব আহরণ করেছেন-তত্ত্বটা তারা কোরান-হাদিস থেকে নিষ্ক্রান্ত করেননি; ইসলামের ইতিহাস থেকেও করেননি।

ইসলামে স্ত্রীপুরুষের বৈষম্য : ইসলামে কোনো সামাজিক সাম্য নেই—কোনোকালেই ছিল না। যে সমাজ গোড়াতেই দাস-প্রভুর সমাজ হিসাবে পরিকল্পিত তাতে সামাজিক সাম্যের কথা বলা অর্থহীন। দাসেদের প্রতি পয়গম্বরের সহৃদয়তাসূচক বাণীটাকে অমূলক বলতে চাই না, কিন্তু ঐ সহৃদয়তা যখন প্রথাটার বিলুপ্তি চায়নি, তখন বলতেই হবে ওরকম উদার বাণী প্রথাটাকে আরো প্রশ্রয় দিতেই বাধ্য। "আমি আমার দাসকে আমার মতোই খাওয়াই পরাই, কাজেই আমার মতো দাস-ব্যবসায়ী হবার যোগ্যতা কার আছে"?—উদার মনিবের এই অনিবার্য প্রশ্নটা অম্লান দত্ত নিজের মনকেও জিজ্ঞাসা করেননি, পাঠকের মনকে তো নয়ই। 'সেকুলার-হিন্দু' বিদ্বানের এই অনুক্তিগুলি তাঁর উক্তির চেয়ে ভয়ানক। অধ্যাপক অম্লান দত্ত বোঝেননি, তিনি প্রকারান্তরে ইসলামের দাস ব্যবসায়ীদের দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, বাকি রেখেছেন শুধু দাসীদের 'ডান হাতে দখল করার' সমর্থনে জয়ঢাক বাজাতে। দরকার হলে ওরকম জয়ঢাকও যে তিনি বাজাতেন, তাঁর লেখাটার ভঙ্গিতেই তা স্পষ্ট।

এই প্রসঙ্গে ইসলামের মারাত্মক স্ত্রীপুরুষ বৈষম্যের কোরানবাণী গুলিও আলোচ্য।—কিন্তু অধ্যাপক অম্লান দত্ত যেহেতু এই বৈষম্যটাকে ঢোঁক গিলেও একটু আধটু স্বীকার করেন, সেইজন্য দুয়েকটা কথা বলেই ক্ষান্ত হব। 'দেশ' পত্রিকার প্রবন্ধে তিনি ইসলামী বহুবিবাহের তাৎকালিক সমর্থনে যে সমস্ত যুক্তি দিয়েছেন তার কোনোটাই প্রামাণিক নয়। তিনি বলেন, উহুদের যুদ্ধে (৬২৫ খ্রি.) যুদ্ধমৃতের আধিক্যের জন্য বহুবিবাহের চল হয়। কিন্তু প্রামাণিক ইতিহাসে ঐ যুদ্ধে ৭৪ জন মাত্র মৃতের সংখ্যা দেওয়া আছে; ৭৪ জন মৃতের বিধবা বা কন্যাদের জন্য বহুবিবাহের চল করতে হবে এ বড় সৃষ্টিছাড়া কথা। তার চেয়ে বড় কথা, বহুবিবাহের বিধান কোরানে উহুদ যুদ্ধের অনেক আগে থেকেই চালু হয় যথা ২৩নং সূরার ৬/৭ আয়াত, ৭০ নং সূরার ২৯/৩০ নং আয়াত। ওগুলিতে বহু বৈধপত্নীর সঙ্গে সঙ্গে বহু দাসীপত্নীর বিধানও জ্বাজ্জ্বল্যমান। উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী ৪৩ আয়াতে বরং বহুপত্নীর সংখ্যা কমিয়ে চার-এ নামানো হয়, কিন্তু বহু দাসীপত্নীর অনিয়ন্ত্রিত সংখ্যাটা তখনও অব্যাহত থাকে। অধ্যাপক অম্লান দত্তের মতো ছেঁদো যুক্তি দেখিয়ে কোরানের মারাত্মক নারী-বিধানগুলির কোনো প্রতিকার হতে পারে না—'সেকুলার হিন্দু' অম্লান দত্তও কিন্তু কিন্তু করে কিছু রিফর্মের প্রস্তাব দিয়েই নিজের কুযুক্তি নিজে গিলে খেয়েছেন।

তিনি বোঝেননি, ইসলামের আর যে প্রথাই সময়ের সঙ্গে তাল রেখে অল্পবিস্তর বদলাতে থাকুক, তার দাসীপত্নীপ্রথা আজো সগৌরবে বিদ্যমান। এসম্বন্ধে আরবদেশের বর্তমান রীতিনীতির কথা আগে বলেছি, কিন্তু এখন বলব ঐ প্রথা ইসলামের এক মস্ত বড় তত্ত্ব—জেহাদ তত্ত্বের আনুষঙ্গিক,—যে জেহাদকে অম্লান দত্ত 'সত্যের সপক্ষে সংগ্রাম', 'অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম' ইত্যাদি প্রলাপ-বাক্যের দ্বারা 'দেশ পত্রিকায়' গৌরবান্বিত করতে চেয়েছেন। তাঁর প্রলাপের পিঠ-পিঠ উত্তর দেওয়া অসাধ্য, কেননা জেহাদের এই অশ্রুতপূর্ব সংজ্ঞার প্রমাণ হিসাবে তিনি কোরান হাদিসের কোনো ধারই ধারেননি।[11] কিন্তু ইসলামে সামাজিক সাম্যের সবচেয়ে বড় বাধা যেহেতু জেহাদ তত্ত্ব সেইজন্য এ সম্বন্ধে দুটো কথা না বললে এই আলোচনা অসমাপ্ত থাকবে।

[11]জেহাদের অম্লান সংজ্ঞার সপক্ষে অম্লান দত্ত কোনো কোরান-বাণী তোলেননি।

সামাজিক সাম্য ও জেহাদ

তলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, কোরেশ-অকোরেশ, আরব-আজম বা আশরফ-আজলফের ভেদা-ভেদের কথা বাদ দিলেও আল্লার-বিধান-প্রাপ্ত দাস-প্রভুর বৈষম্য একটা বিশেষ কারণে ইসলাম থেকে দূর করা অসম্ভব বললেই চলে। পাশ্চাত্য জগতের চাপে কোনো ইসলামী দেশেই আজ দাসপ্রথার প্রকাশ্য স্বীকৃতি নেই। কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ ইসলাম থেকে (খাতায় কলমেও) ইসলামী দাসপ্রথার মূলীভূত জেহাদের তত্ত্বটা দূর করতে পারেনি বা করেনি। প্রাক্-ইসলামী-আরবেও দাসপ্রথা ছিল কিন্তু জেহাদের তত্ত্ব ছিল না। বেদুইন দস্যুরা যাকে তাকে লুট ক'রে দাস হিসাবে বেচাকেনা করত কিন্তু ইসলামেই প্রথম পঞ্চাঙ্গ জেহাদের অন্তর্ভুক্ত করে ঐ প্রথাকে পাকাপাকি স্থায়িত্ব দেওয়া হয়। পঞ্চাঙ্গ জেহাদ হচ্ছে (১) বিধর্মীর মধ্যে জবরদস্তি ইসলাম প্রসার, (২) বিজিত বিধর্মিকুলের গণহত্যা, (৩) বিধর্মীর দেশে জিজিয়া প্রতিষ্ঠা, (৪) বিধর্মীর সম্পত্তিগ্রাস এবং (৫) বিধর্মীর নারীশিশুকে কল্‌মা পড়িয়ে দাসদাসীরূপে চালান দেওয়া। লুট করা সম্পত্তি এবং লুট করা নারীশিশুকে পরিভাষায় বলে 'গনিমৎ' বা সৌভাগ্য। কোরানে এই সৌভাগ্যকে বলেছে "বৈধ ও পবিত্র" (কো ৮/ ৬৯)। এই বৈধ ও পবিত্র সম্পত্তির ভাগাভাগির ব্যবস্থা কোরানেই লেখা আছে (কো ৮ /৪১)। তাছাড়া কোরানে জেহাদকে ইসলামের সর্বোত্তম কর্তব্য বলেও মানা হয়েছে (কো ৯/১৯-২২, ৪/৯৫)। তার ফলে প্রকাশ্য ভাবে দাসপ্রথা উঠে গেলেও ইসলামী জেহাদে দাসদাসী সংগ্রহ (বিশেষ করে দাসী সংগ্রহ) এখনো পবিত্র কর্তব্যের অংশবিশেষ বলে গণ্য। এই দাসী সংগ্রহ '৪৬ সালে কলকাতা-নোয়াখালিতে ঘটেছে, এ মুহূর্তে কাশ্মীরে ঘটছে, ঘটছে বসনিয়ায় ও সুদানে। 'সেকুলার হিন্দু' লেখক যখন ইসলামের ব্রাদারহুড নিয়ে উচ্ছ্বাস করেন তখন ইসলামী দাসপ্রথার এই মূলীভূত জেহাদ-তত্ত্বের কথা মনে রাখেন না। অথবা মনে রাখলেও অম্লান দত্তের মতো—জেহাদ মানে "সত্যের সপক্ষে সংগ্রাম", জেহাদ মানে "অত্যাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই"—ইত্যাদি প্রলাপবাক্য বকে থাকেন।[12]

[12]জেহাদতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য এই লেখকের "জেহাদ" (হিন্দুত্ববুক্স ওয়েবসাইটে সহজলভ্য) দেখুন । ও বই-এর পরিশিষ্টে অম্লান দত্তের প্রলাপ বাক্যের চুলচেরা আলোচনা আছে।

পরিশিষ্ট : হিন্দু জাতিভেদের ইসলামীমূল

অধ্যাপক অম্লান দত্ত ঢোঁক গিলতে গিলতে ইসলামের (তথাকথিত) সামাজিক সাম্যের আদর্শের মধ্যে পয়গম্বরোত্তর কালে কিছু বিচ্যুতি লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতো ইসলামপ্রেমী মানুষ, তাঁর প্রাণের প্রিয় ইসলামেও কিছু বিচ্যুতি দেখতে পেয়েছেন এতেই আমরা বিস্মিত ও কৃতকৃতার্থ। কিন্তু ঐ বিচ্যুতির কথা বলতে গিয়েও তিনি হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে একটা বিশ্রী ও মিথ্যা অপবাদ না দিয়ে পারেননি। তিনি বলেন :

"[অদ্বৈতবাদ আর অস্পৃশ্যতার পাশাপাশি চলার] অসামঞ্জস্য অধিকাংশ উচ্চবর্ণের হিন্দুকে পীড়ন করে না। মোহাম্মদ যে ভাষায় সাম্যের কথা বলেছেন তাতে এ জিনিস সম্ভব নয়। [তবে কিনা] 'আশরাফ' ও 'আতরাফ' অর্থাৎ কুলীন ও অন্ত্যজ মুসলিমদের ভিতর বাংলা দেশে বিভেদ চোখে পড়ে"।

এই অনুচ্ছেদে উচ্চবর্ণের হিন্দুকে যে গালি দেওয়া হয়েছে তার মিথ্যাচারিতা নিশ্চয়ই অম্লান দত্তের অজানা নয়। উচ্চবর্ণের হিন্দু যদি গান্ধী-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-বিনোবা প্রভৃতি উচ্চবর্ণের হিন্দুর মুখ থেকে অস্পৃশ্যতা পাপের জন্য মর্মস্পর্শী অনুশোচনা বাক্য শুনে অভিভূত না হত, তাহলে কতকগুলি নীচাশয় রাষ্ট্রনেতা কিছুতেই আজকের ভারতকে মণ্ডল কমিশনের নামে 'সিভিল ওয়ারে'র অবস্থায় ঠেলে দিতে পারত না। বস্তুতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দু আধুনিক ভারতে অস্পৃশ্যতার জন্য যে ধরনের প্রায়শ্চিত্ত করেছে ও করছে পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। দুঃখের বিষয় এত করেও সে অম্লান দত্তের মতো 'সেকুলার হিন্দু'র মন পায়নি। এই শ্রেণীর লোক হয়তো সারা ভারতকে ইসলামী সাম্যের হাতে তুলে না দিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুর বিরুদ্ধে দুর্বাক্য বলা থেকে বিরত হবে না।—কিন্তু এখনকার মতো সে কথা থাক।

যে কথাটা এখনকার মতো বোঝা দরকার সেটা এই—'আশ্‌রফ'—'আত্‌রফে'র (=আজ্‌লফ) বৈষম্যকে অম্লান দত্ত যেভাবে শুধু বাঙলাদেশী মুসলিম সমাজের ভিতরকার বিভেদ হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন সে কথা মোটেই সত্য নয়। আগেই বলেছি তুর্কিরাই এদেশে ঐ বিভেদ প্রচার করে। ঐতিহাসিক বারানী ঐ বিভেদের যুক্তি হিসাবে বলেছিলেন : হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা (অর্থাৎ তুর্কি যারা নয় সেই মুসলমানরা) হচ্ছে low bom bazaar people। কিন্তু ঐ বিভেদ বারানী সৃষ্টি করেননি। দাস-প্রভুর বৈষম্য ও কোরেশ-অকোরেশের বৈষম্য ছিল গোড়া থেকেই ইসলামের শাস্ত্রীয় বৈষম্য—তার থেকেই আশরফ-আজলফের বৈষম্যের উৎপত্তি।

বোধ হয় অম্লান দত্তের কথার মধ্যে একটা ইঙ্গিত আছে। আশ্‌রাফ-আত্‌রাফে'র নামান্তর হিসাবে কুলীন-অন্ত্যজ শব্দ ব্যবহার করে তিনি হয়তো বলতে চান, আদি ইসলামের সামাজিক সাম্য হিন্দুসমাজের সংস্পর্শে এসেই নষ্ট হয়েছে। এই ইঙ্গিত তাঁর অভিপ্রেত কিনা জোর দিয়ে বলা যায় না, কিন্তু 'আদি ইসলামে জাতিভেদ ছিল না, ভারতে এসে মুসলমানরা জাতিভেদের পাল্লায় পড়েছে' এরকম কথা বহু পণ্ডিতম্মন্য লোকের মুখেই শোনা যায়। প্রচারটা আদৌ মিশনারিদের,

কিন্তু এযুগে 'সেকুলার হিন্দু'রাও এই প্রচারে যোগ দিয়েছে। যে ইসলাম পৃথিবীর জঘন্যতম দাসপ্রথা ও দাসীপত্নী প্রথার জন্য দায়ী এবং যে ইসলামী বৈষম্যের জন্য আজ পর্যন্ত কোনো ইসলামী বিদ্বান খেদ প্রকাশ করেননি—তার দায়দোষও চাপানো হবে হিন্দুর কাঁধে, এরকম উৎকট বদ্-রসিকতার কথা আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি।

আসল ঘটনা ঠিক বিপরীত। তুর্কি সন্ত্রাসের যুগেই হিন্দু সমাজের জাতিবিভাগ-প্রথা দুরন্ত জাতিভেদ প্রথায় রূপান্তরিত হয়। একথা বলব না যে প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের বৈষম্যের মধ্যে এর বীজ ছিল না। কিন্তু রামের সঙ্গে গুহক চণ্ডালের মিতালি, কসাই ধর্মব্যাধের দ্বারা তপস্বী ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশদান, শক হূণ প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতির ক্ষত্রিয়-জন্মলাভ প্রভৃতি দৃষ্টান্তে বোঝা যায় প্রাচীন যুগের জাতিবিভাগ কোনো দিন উচ্চনীচ বৈষম্যে প্রস্তরীভূত হয়ে জাতিভেদের নামান্তর হয়নি। হীনবর্ণের ভোঁসলে বংশজাত শিবাজীকেও ক্ষত্রিয় নাম পেতে হয়েছিল অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে; কিন্তু তার কারণ, দস্যুপীড়িত ভারত মধ্যযুগে আত্মরক্ষার জন্যই ছুঁৎমার্গ ছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পায়নি। আমাদের সামাজিক ইতিহাস এখনো পাকাপাকি ভাবে লেখা হয়নি, কিন্তু নানা সূত্র থেকে যেটুকু খবর পাওয়া যায় তার তাৎপর্য খুবই স্পষ্ট।

বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ' পুস্তকে বাংলার কৌলীন্য প্রথার উৎপত্তির একটা বিবরণ আছে। এই বিশ্রী প্রথার জন্য হিন্দুসমাজকে বিকটভাবে গালমন্দ করার অভ্যাস ১৯শ শতাব্দীতেই শুরু হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর এর একটা অন্য দিকও দেখিয়ে দেন। তিনি দেখান তুর্কী যুগেই কৌলিন্যের একমাত্র লক্ষ্য দাঁড়ায় বিবাহ সম্বন্ধ নিয়ে কড়াকড়ি। তুর্কি যুগে এই কড়াকড়ির ফলে নিয়ম হয়, 'মেলের' বাইরে বিয়ে হবে না। তখন থেকে কুললঙ্ঘনকারী বিয়ের নানা দোষের এক-একটা ফর্দ বানিয়ে কুলীনদের একেকটা 'মেল' তৈরি হতে থাকে। বিদ্যাসাগর 'ফুলিয়া মেলের' কুলীনদের চার রকম কুলদোষের মধ্যে বন্ধুদোষ নামে একটা দোষের বিবরণ দিয়েছেন, সে বিবরণ রোমহর্ষক। তিনি সংস্কৃত শ্লোক তুলে বলেন :

অনূঢ়া শ্রীনাথসুতা ধন্ধঘাটস্থলে গতা
হাঁসাই খানদারেন যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্ধস্থানগতা কন্যা শ্রীনাথচট্টজাত্মজা
যনেন চ সংসৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ॥

অর্থাৎ "শ্রীনাথ চাটুজ্যের মেয়ে ধন্ধঘাটে নদী পার হতে গিয়ে হাঁসাই নামে যবনের দ্বারা দূষিত হয়। হাঁসাই ছিল ঐ ঘাটের থানাদার (=ঘাটোয়াল)। শ্রীনাথ (গোপনে) মেয়েকে কংসপুত্র (পরমানন্দের) সঙ্গে বিয়ে দেয়"। তখন থেকে শ্রীনাথের বংশ এবং কংসের বংশ দুষ্ট হয়ে যায়। এই ধন্ধদোষের সঙ্গে আরও তিনরকম 'বৈবাহিক' দোষের মিশ্রণে কুলীনদের যে 'মেল' তৈরি হয় তার নাম 'ফুলিয়া মেল'। এক কথায় বলা যায় বাংলার কদর্য কৌলীন্য প্রথারও (নানা কারণের মধ্যে) অন্তত একটা কারণ হচ্ছে তুর্কিযুগের সন্ত্রাস।

আশ্চর্য এই যে এরকম 'যবনস্পর্শ দোষেও' 'ফুলিয়া মেলের' ব্রাহ্মণদের পতিত করা হয়নি। তারা শুধু তখন থেকে মেলের বাইরে বিয়ে করতে পারত না। এর থেকে বোঝা যায়, তখনও জাতিপ্রথা প্রস্তরীভূত হয়ে যায়নি। কিন্তু ক্রমশই হিন্দুসমাজ ছুঁৎমার্গের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে চাইল। যবনস্পৃষ্ট জাতগুলোকে সে 'পতিত' করতে লাগল। ঐতিহাসিক K. S. Lal তাঁর The Legacy of Muslim Rule in India বই-এ এর কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

(১) তিনি বলেন, ইসলামী সন্ত্রাসের একেবারে গোড়ার দিকে সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলের জাট ও খোখর জাত কয়েক'শ বছরের সন্ত্রাসে আচারভ্রষ্ট হয়ে পতিত হয়ে যায় (were pushed into belonging to low castes of today)।

(২) তিনি বলেন, ভারতে আজ দেড় কোটি 'শতনামী' জাতের লোক হরিজন পর্যায়ভুক্ত হয়েছে এর কারণ হচ্ছে আওরঙ্গজেবের সন্ত্রাস। এই শতনামীরা ছিল দিল্লীর ১০০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত নার্ণৌল অঞ্চলের 'ভদ্র জাত'। আওরঙ্গজেব যখন 'জেহাদ' করে তাদের নার্ণৌলের বাসভূমি ধ্বংস করেন তখন হতাবশিষ্ট শতনামীরা মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বিহার আর উত্তরপ্রদেশের নানা স্থানে পালিয়ে গিয়ে সমাজভ্রষ্ট হয়ে হরিজন হয়ে যায়।

এই দুটি দৃষ্টান্তে বেশ বোঝা যায়, আধুনিক যুগে S.C/S.T.-র সমস্যা অনেক দূর পর্যন্ত তুর্কি-সন্ত্রাসের ফল। K. S. Lal নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচারের কথাটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন[13]। একথা মানতেই হবে, জাতিপ্রথার বাঁধাবাঁধি না থাকলে এরা 'পতিত' হত না। কিন্তু বিপরীতক্রমে এও সত্য যে, জাতিপ্রথা না থাকলে নানা 'যবনস্পৃষ্ট' জাতের সঙ্গে অবাধ মিশ্রণের ফলে গোটা হিন্দু জাতটাই মুসলমান হয়ে যেত। পৃথিবীর আর প্রত্যেকটি ইসলামী দেশে তাই ঘটেছে। হিন্দুর ক্ষেত্রে তা হয়নি কেননা আচারের কঠোরতা মেনেই তুর্কিপীড়িত হিন্দুসমাজ হিন্দু পরিচয় রক্ষা করতে পেরেছিল। মুসলমান হলে তারা সবাই 'অন্ত্যজ বাজারে' মুসলমান হয়ে যেত। সেক্ষেত্রে এযুগের 'সেকুলার হিন্দু'রাও সেই অন্ত্যজ মুসলমানের বংশধর হয়ে আল্লাহো আকবর ধ্বনি তুলে 'ইসলামী সাম্যের' গুণগান করতেন।

মিশনারি, ব্রাহ্মসমাজ, এবং এযুগের সেকুলার হিন্দুরা জাতিভেদ নিয়ে যে সমস্ত কথা বলেছে তার বেশির ভাগই মিথ্যা। সবচেয়ে উৎকট মিথ্যা হচ্ছে ইসলামী সাম্যের সঙ্গে হিন্দুর জাতিভেদের তুলনা। ইসলামী দাসপ্রথার উৎকটতম রূপ দেখা যায় তুর্কি ভারতে। ইংরেজ আমলে এখানকার মুসলিম সমাজ ঐ দাসপ্রথাকে যেভাবে অনায়াসে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় তার একটা মস্ত কারণ হচ্ছে হিন্দু প্রভাব। এখনো হায়দ্রাবাদের অলিতে গলিতে গোপন সওদাগরির কথা বাদ দিলে ভারতের আর কোনো অঞ্চল থেকে আরব দেশে দাসী চালানের পাকা ব্যবস্থার কথা শোনা যায় না। শেখ-সৈয়দ বংশীয় নীল রক্তের মুসলমানরাও তাদের শাস্ত্রীয় দাসীভোগের হক্কের পাওনা নিয়ে এদেশে আজ আর কোলাহল করে না। এগুলি মুসলিম সমাজের উপর হিন্দুপ্রভাবের সুফল। অধ্যাপক অম্লান দত্তের মতো 'সেকুলার হিন্দু' যখন এসব কথা ভুলে গিয়ে হিন্দু জাতিভেদের সঙ্গে তুলনা করে ইসলামী সাম্যবাদের গুণগান শুরু করেন তখন বুঝতে পারি সেকুলার হিন্দুদের শুধু 'আল্লা হো আকবর' আওয়াজ তোলাটাই বাকি আছে। আমার বিনীত প্রশ্ন : ঐটেই বা আর বাকি থাকে কেন?

[13]পূর্বোদ্ধৃত বই-এর ২৭১-৭৬ পৃষ্ঠার মধ্যে লাল মহোদয় এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ইসলাম কি যুক্তিবাদী ধর্ম?

গাঁজাখোর যেমন ছিলিমের পর ছিলিম টেনে কল্পনার অশ্বডিম্বে তা দিতে দিতে বিভোর হয়ে যায়, অধ্যাপক অম্লান দত্ত তেমনি ইসলাম সম্বন্ধে একের পর এক কাল্পনিক তত্ত্ব আওড়ে গেছেন। ইসলামের 'সর্বমানবিকতা' তত্ত্ব, 'সামাজিক সাম্যে'র তত্ত্ব, 'সত্যের সপক্ষে জেহাদী সংগ্রামের' তত্ত্ব—সবই তিনি তাঁর নিজের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে টেনে বার করেছেন—কোরান-হাদিসের শিক্ষার সঙ্গে এগুলির কোনো সম্বন্ধ খোঁজবার চেষ্টা করেননি। কিন্তু তাঁর গাঁজাখুরি ইসলামচর্চা চরমে পৌঁছেছে যখন তিনি ইসলামকে 'যুক্তির ধর্ম' নাম দিয়ে পরমতম অম্লানবাণীটা উচ্চারণ করেছেন। এই লেখক নিশ্চয় জানেন, Fanaticism (ধর্মান্ধতা) শব্দটা সারা পৃথিবী জুড়ে ইসলাম সম্বন্ধেই বেশি প্রচলিত। খ্রীস্টানরা বহুকাল থেকেই সে কথা প্রচার করে আসছে এবং তা নিয়ে অনেক কাহিনীও বর্ণনা করেছে। আলেকজান্ড্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত লাইব্রেরি জ্বালিয়ে দেওয়ার সপক্ষে খলিফা ওমরের যুক্তিটা ক্লাসিক্যাল হয়ে আছে। খ্রীস্টধর্মের ধর্মান্ধতা শুধু ইসলামের চেয়েই কম, কাজেই তাদের কথা কোনো সময়েই জোরালো তথ্যপ্রমাণ ছাড়া মানা যায় না। গীবন আলেকজান্ড্রিয়ার লাইব্রেরি পোড়ানোর ঘটনাটা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু গীবন জানতেন না, আলেকজান্ড্রিয়ার না হোক পারস্যের লাইব্রেরি জ্বালানো সম্বন্ধে ওমরবাণীর কিছু সুদৃঢ় তথ্যপ্রমাণ আছে। 'কোনো বই যদি কোরানসম্মত হয়, তবে তা ফালতু, আর যদি কোরানবিরুদ্ধ হয়, তবে তা বিষাক্ত—কাজেই ও সব পুড়িয়ে ফ্যালো, গুঁড়িয়ে ফ্যালো।'—ওমরের এই বাণীই স্বাধীন জ্ঞান-গবেষণা সম্বন্ধে ইসলামের শেষ কথা। এই ইসলামকে অধ্যাপক অম্লান দত্ত 'যুক্তির ধর্ম' বলে মানপত্র দিয়েছেন।

অম্লান দত্ত 'দেশ' পত্রিকার প্রবন্ধে বলেন :

'তৎকালীন ইহুদী বা খ্রীস্টধর্মের তুলনায় ইসলাম ছিল অপেক্ষাকৃত যুক্তিপন্থী। যীশুখ্রীস্ট ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, এই খ্রীস্টীয় বিশ্বাস মোহাম্মদের অযৌক্তিক মনে হয়েছে।'

অম্লান দত্ত বোধ হয় জানেন না, যীশুর মায়ের অপৌরুষেয় পুত্রজন্মদান মোহাম্মদের কাছে অযৌক্তিক মনে হয়নি বরং গীবনের মতে Immaculate Conception-এর তত্ত্বটা ক্যাথলিক চার্চ নাকি কোরান থেকেই ধার করে[14]। অম্লান দত্ত হয়তো এও জানেন না যে, আল্লাপুত্রত্ব ছাড়া যীশুর আর প্রত্যেকটি অলৌকিক ক্রিয়াকর্মেই পয়গম্বরের পরম আস্থা ছিল—তিনি নিজেও দুয়েকটা নূতনতর অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম আরোপ করে যীশুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। আল্লা বলেন :

"সে (যীশু) বলবে : আমি (অলৌকিক) নিদর্শন এনেছি।...মাটি দ্বারা পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করব, অতঃপর আমি তাতে ফুঁ দেব, ফলে আল্লার অনুমতিক্রমে উহা পাখি হয়ে যাবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করব এবং আল্লার অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবন্ত করব" (মৌলানা

[14]গীবন : "The wonders of the genuine and apocryphal gospels are profusely heaped on his (=Jesus') head; and the Latin Church has not disdained to borrow from the Koran the immaculate conception of his virgin mother"

মোবারক করিম জওহরের অনুবাদ, কো ৩|৪৯)।

দেখা যাচ্ছে, যীশু সংক্রান্ত কোনো 'অবদানই' কোরানের চোখে 'অযৌক্তিক' মনে হয়নি, বরং মাটির পাখিকে ফুঁ দিয়ে জ্যান্ত পাখি বানানোর বাইবেল-বহির্ভূত (?) গল্পটাও তার কাছে যুক্তিসিদ্ধ মনে হয়েছে। তা হোক, কিন্তু 'প্রেরিত পুরুষ' মানলেও কোরান তো 'প্রেরিত পুত্র' মানেনি। অম্লান দত্তের মতো পণ্ডিতের কাছে ঐটাই হচ্ছে যুক্তিবাদ। তাঁর মতো যুক্তিবাদীকে একথা বোঝানো শক্ত যে প্রেরিত পুত্রের তত্ত্বটা যদি অযৌক্তিক হয় তাহলে 'প্রেরিত পুরুষের' তত্ত্বটাও ধাপে টেকে না। নিরপেক্ষ মানুষের কাছে "মোহাম্মদ প্রেরিত পুরুষ ও শেষ নবী" এবং "যীশু-প্রেরিত পুত্র ও একমাত্র ত্রাণকর্তা"—এই দুই বিশ্বাস একই স্তরের বিশ্বাস; যে লোক একটাকে আরেকটার চেয়ে বেশি যুক্তিযুক্ত ভাবে, তার যুক্তিবাদের ধারণাটা তারই, অন্যে এ-দুটোকে 'বিশ্বাস' বলেই ভাববে, অনেকে বলবে 'অন্ধবিশ্বাস'।

নজরনের খ্রীস্টানদের সঙ্গে পয়গম্বরের যুক্তিতর্ক

কতখানি অন্ধবিশ্বাস তার একটা চমৎকার প্রমাণ পয়গম্বর জীবনীতেই পাওয়া যায়। আরবদেশের নজরন অঞ্চলের খ্রীস্টানরা যীশুর আল্লাপুত্রত্ব নিয়ে তর্ক করতে চাইলে (৬৩১ খ্রী.) পয়গম্বর তাদেরকে যুক্তিতর্ক দিয়ে নিরস্ত করবার প্রয়োজন বোধ করেননি, তিনি বলেছিলেন, "এসো আমাদের দুপক্ষ পরস্পরের উপর আল্লার 'লানৎ' (=অভিশাপ) মেগে শপথ করি; যার কথা মিথ্যা, আল্লাই তাকে ধ্বংস করে তর্কটার ফায়শালা করে দেবেন[15]।" এ সম্বন্ধে পয়গম্বর জীবনীকার D. S. Margoliouth বলেন :

"If the Christian leaders refused to settle the matter by the process recommended from Heaven, it was probably because they regarded it as a trap : the Prophet would merely have to send some legions to Najran, with orders to destroy the persons on whom destruction had been invoked, and the truth of his doctrine would be demonstrated." (Muhammad and the Rise of Islam, Page 435)—পয়গম্বরের যুক্তিপন্থার চরিত্রটা মার্গোলিওথ খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

পয়গম্বরের তথাকথিত অলৌকিক-বিমুখতা

ইসলামের 'যুক্তিপন্থার' 'প্রমাণ' দিতে গিয়ে অম্লান দত্ত লিখেছেন :

"হজরত মোহাম্মদ [পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের মতো] কোনো অলৌকিক প্রমাণ দাখিল করবার প্রয়োজনই বোধ করেননি। তিনি বলেছেন, এই যে আমাদের চোখের সামনে সূর্যচন্দ্রগ্রহতারকাময় অত্যাশ্চর্য বিশ্ব; এই যে মানুষের চেতনার অতুল ঐশ্বর্য—এইসবের ভিতর দিয়েই আল্লার মহিমা ও অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়"।

এ সম্বন্ধে বলব, অধ্যাপক অম্লান দত্ত বোধহয় কোরান-হাদিসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার বইকে গুলিয়ে ফেলেছেন। "আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ" ইত্যাদি বাণী রবীন্দ্রবাণী,

[15]তর্কটার উল্লেখ কোরানেই আছে। আল্লা বলেন : And whoso disputeth with thee [ie. Muhammad] concerning him (e. Jesus] say (unto him) : Come! we will...invoke the curse of Allah upon those who lic" (K3|61 পিক্টহলের অনুবাদ)

ওগুলি আল্লার বাণীও নয়, পয়গম্বর বাণীও নয়। কোরান আর পয়গম্বরের নামে অম্লান দত্ত অনেক গাঁজাখুরি কথা পাচার করেছেন, কিন্তু এখানে ছিলিমটা একটু বেশি হয়ে গেছে বলে অনুমান করি। পয়গম্বরের অলৌকিক শক্তি-সংক্রান্ত বিতর্ক ইসলামের একটা মস্তবড় তর্ক, তিনি ঐ প্রসঙ্গের কিছুই জানেন না।

প্রথমতঃ, কোরানে পয়গম্বরের অলৌকিক শক্তির কথা কম বলা হয়েছে ঠিকই[16], কিন্তু এ সম্বন্ধে জবাবদিহির বহর দেখেই বোঝা যায় অলৌকিক-শক্তি-হীনতাকে পয়গম্বর একটা মস্তবড় 'খাম্‌তি' বলেই জানতেন এবং "আল্লা আমাকে এই শক্তি দেননি" বলে বারবার জবাবদিহি করতেন। দ্বিতীয়তঃ, কোরানের 'খাম্‌তি'টা হাদিসে খুব অপর্যাপ্তভাবেই পূরণ করা হয়। গীবন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গরসের ভঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন, হাদিসে বিষমেশানো মাংসের হাড় পয়গম্বরকে দৈববাণী দিয়ে বলে "এ মাংস তুমি খেয়ো না রসুল, এতে বিষ আছে"। এরকম অবিশ্বাস্য অলৌকিকের সম্ভারে হাদিস-সাহিত্য পরিপূর্ণ, অম্লান দত্ত এগুলির কোন খবর রাখেন না।

[গীবন : (The votaries of Maoammed) believe or affirm that trees went forth to meet him; that he was saluted by stones, that water gushed from his fingers; ...that a beam groaned to him; that a camel complained to him; that a shoulder of mutton informed him of its being poisoned... ইত্যাদি ইত্যাদি।]

তাছাড়া "মোহাম্মদ অলৌকিক প্রমাণ দাখিল করবার প্রযয়োজনই বোধ করেননি"—অম্লান দত্তের এই কথাটা যে কত অসার সেকথা কোরান থেকেই প্রমাণ করা যায়। কোরানে অলৌকিক ক্রিয়াকর্মকে বলা হয়েছে 'নিদর্শন' (=sign, আরবী 'আয়া' বা 'আয়াত') অর্থাৎ কিনা 'আল্লার-নিদর্শন'। কোরানের পাতায়-পাতায় পয়গম্বরের কর্মকাণ্ডে এই নিদর্শন হীনতার জবাবদিহি করা হয়েছে। এই জবাবদিহির বহর দেখলেই বোঝা যায়, অলৌকিক প্রমাণ দাখিল করবার প্রয়োজন পয়গম্বর খুব তীব্রভাবেই অনুভব করছিলেন, তাইতেই তাঁর অক্ষমতার জন্য কোরানের আল্লার এত জবাবদিহি। কয়েকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক।

১। "'বল,' আমি (=মোহাম্মদ) তোমাদের এমন বলি না যে আমার নিকট আল্লার ধনভাণ্ডার আছে। অদৃশ্য সম্বন্ধেও আমি অবগত নই।...আমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয় আমি বরং তারই অনুসরণ করি।" (কো/৬৫০) এখানে পয়গম্বর 'আকাশভরা সূর্যতারার' যুক্তি দেননি, কিন্তু বিনম্র হয়ে, 'নিদর্শন' দেখতে না পারার জন্য কিন্তু-কিন্তু করেছেন।

২। "পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করাকেই আমাকে (=আল্লাকে) নিদর্শন প্রেরণ করা থেকে বিরত রাখে। আমি নিদর্শনরূপে সামুদের নিকট উষ্ট্র পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর তারা ওর প্রতি জুলুম করে" (কো ১৭/৫৯)ঐ অনুবাদ। এখানেও "আকাশভরা সূর্যতারার" উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু এই জবাবদিহিটা বিনয়নম্রও নয়। এটা একেবারেই পাশ কাটানোর যুক্তি।

৩। And when they said : O Allah! If this be indeed the truth from thee, then rain down stones upon us or bring on us some painful doom.

But Allah would not punish them while thou (=Mohammed) wast with them nor will He punish them while they seek forgiveness (K 8/32-33)।

এই আশ্চর্য যুক্তিটা একটু ভেবে দেখবার মতো। পয়গম্বর এখানে নম্রতাও দেখাচ্ছেন না, 'নিদর্শনহীনতা'র অক্ষমতাকে পাশ কাটিয়েও যাচ্ছেন না। এর আগে তিনি আল্লার জবানিতে মক্কাবাসী কোরেশদের উপর বছরের পর বছর অভিশাপ বর্ষণ করে আসছিলেন, এই দুইটি

[16]দুটো 'মিরাক্‌ল্' কোরানেই বলা আছে। ১৭|১-এ আছে পয়গম্বর একরাত্রির মধ্যে মক্কা থেকে জেরুজালেম গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আল্লার কাছে পৌঁছে যান এবং সেই রাত্রেই মক্কায় ফিরে আসেন। ৫৪।১-২-এ আছে তিনি একবার চাঁদকে দু'টুকরো করে ফেলেন।

আয়াতে তারই ইঙ্গিত আছে। "তোরা মরবি, তোদের পতনের আর দেরি নেই। আল্লা যুগে যুগে কত পৌত্তলিক জাতকে ধ্বংস করেছেন, তিনি আদ্‌কে ধ্বংস করেছেন, সামুদকে ধ্বংস করেছেন, ফেরাউনের বাহিনীকে ধ্বংস করেছেন, কোনো পৌত্তলিককেই রেয়াত করেননি"। এই অবিশ্রান্ত অভিশাপের তর্জনে অতিষ্ঠ হয়ে কোরেশরা বলেছিল "ক্ষমতা থাকলে আল্লা আমাদের ধ্বংস করুন। তিনি শিলাবৃষ্টি করে দেখান যে তুমিই তার দূত।" পয়গম্বর এরই উত্তরে এই দুটি আয়াতে জানাচ্ছেন তোমাদের মধ্যে আল্লার দূত আছেন, তাইতেই তিনি শিলাবৃষ্টি করেননি।

যুক্তিটা আশ্চর্য কেননা আল্লা নিশ্চয় অলৌকিকভাবে তাঁর ভক্তকে বাঁচিয়ে অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করতে পারতেন। বস্তুত কোরানেও এরকম বাছাই-করা ধ্বংসলীলার বিবরণ আছে। কাজেই যুক্তিটা বড় আশ্চর্যই বলতে হয়। বোঝা যায় অলৌকিক শক্তি প্রকাশের অক্ষমতা পয়গম্বরকে কতখানি অপ্রস্তুত করেছিল। "তিনি অলৌকিক প্রমাণ দাখিল করবার প্রয়োজনই বোধ করেননি" এই অম্লান বাণীর মতো বাজে কথা আর হয় না।

এই প্রসঙ্গে গীবনের বই থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়েই অধ্যাপক অম্লান দত্তের দেওয়া অসার তর্কটার আলোচনা শেষ করব। গীবন বলেন :

"As often as (the prophet) is pressed by the demands of the Koreish [for miracles] he involves himself in the obscure boast of vision and prophecy, appeals to the internal proofs of his doctrine, and shields himself behind the Providence of God, who refuses those signs and wonders that would depreciate the merit of faith and aggravate the guilt of infidelity. But the modest or angry tone of his apologies betrays his weakness and vexation.

গীবন এক কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন পয়গম্বর 'অলৌকিকের প্রয়োজন বড় তীব্রভাবেই বোধ করেছিলেন,' তারি জন্য জবাবদিহি করেছিলেন বার বার, কখনো নম্রভাবে কখনো ক্রুদ্ধভাবে। কিন্তু তিনি আকাশভরা সূর্যতারার যুক্তি দেননি একবারও।

কোরানের অলৌকিকত্ব : তাছাড়া কথাটা অত্যন্ত ছেলেমানুষিও বটে। ইসলামের সমস্ত সৌধটাই দাঁড়িয়ে আছে কোরানের অলৌকিকতার উপর, এবং অলৌকিক শক্তিবলে পয়গম্বরের দ্বারা তেইশ বছর ধরে মাস মাস এবং বছর বছর আল্লার 'অলৌকিক বাণী' পাওয়ার উপর। আরবীতে কোরানের বাক্যকেই বলে 'আয়াত' বা 'অলৌকিক নিদর্শন'। পয়গম্বর যদি আর কোনো 'অলৌকিকে'র প্রয়োজন নাও বোধ করে থাকেন তাতেও তাঁর অলৌকিক-নির্ভরতা অপ্রমাণ হয় না। কোরানের অলৌকিকত্বই তার ধর্মের মূলস্তম্ভ এবং এই কথাটা কোরানেই স্পষ্টাক্ষরে বলা আছে। "If we had caused the Quran to decend upon a mountain, thou (O Muhammad) verily hadst seen it humbled, rent asunder by the fear of Allah" (K 59/21) অর্থাৎ আল্লা যদি পর্বতের উপর কোরান নামাতেন, তাহলে পর্বতটাই ফেটে চৌচির হয়ে যেত। অলৌকিক আর কাকে বলে? বাক্যের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে এর চেয়ে বেশি অন্ধবিশ্বাস কি আর কোনো শাস্ত্রে আছে?

কোরানের আয়াত সম্বন্ধে ইসলামী কুসংস্কার

কোরান-বাক্যের জাদুশক্তি সম্বন্ধে ইসলামী সমাজে কুসংস্কার এমন বদ্ধমূল যে, প্রতিটি মুসলিম দেশে বিশেষ বিশেষ আয়াতের তাবিজ বানিয়ে বা আয়াতধোয়া জল খাইয়ে, মুসলমানের রোগমুক্তি, প্রাপ্তিযোগ এবং মারণ-উচাটন-বশীকরণের বিশাল ব্যবস্থা আছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বাংলাদেশী মৌলানা

মাজাহারউদ্দীন লিখিত 'নামাজ-শিক্ষা' বই থেকে একটু উদ্ধৃতি দিই।

সূরা জিলজালাহর (৯৯নং সূরা) ফজিলৎ (=ফলশ্রুতি?) সম্বন্ধে মৌলানা বলেন :

"এই ছুরা অপহৃত বাসনে লিখিয়া বাতগ্রস্ত রোগীকে খাওয়াইলে উপকার হইবে। যদি কেহ [এই] ছুরা স্বপ্নে দেখে তবে সে কাফেরকুল নিধন করিবে।"

সূরা ইনসেরাহ সম্বন্ধে বলেন :

"কেহ এই সূরা পড়িয়া বুকে ফুঁ দিলে বুকের বেদনা প্রশমিত হইবে। ইহা লিখিয়া পান করিলে পাথরি রোগ দূর (sic) হইয়া যাইবে এবং আমাশয় পীড়াও ভালো হইবে।"

মৌলানা আরো বলেন :

আয়াতুল কুরসি সাতবার পড়িয়া চাউলে দম করতঃ সেই চাউল সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে খাও-য়াইয়া দিলে প্রকৃত চোর অবশ্যই ধরা পড়িবে। উহার মুখ একেবারে শুকাইয়া যাইবে অথবা মুখ হইতে রক্ত বাহির হইবে।"

অম্লান দত্ত ইসলামের যে 'যুক্তিপন্থার' কথা লিখেছেন তার ব্যবহারিক চরিত্র এই রকম। 'যুক্তিপন্থাই' বটে।[17]

শেষ নবীতত্ত্ব ও যুক্তিবাদ

ইসলামের সর্বজনবিদিত ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন চরিত্রকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে অধ্যাপক অম্লান দত্ত তাঁর আপন-মস্তিষ্ক-নির্গত এক কাল্পনিক যুক্তিবাদী ইসলামের ঢাক বাজিয়েছেন। সেই ঢাকের বাদ্যি চরমে পৌঁছেছে পয়গম্বরের শেষ নবীত্বের এক রোমহর্ষক ব্যাখ্যার মধ্যে।

'দেশ' পত্রিকার প্রবন্ধে অম্লান দত্ত বলেন:

"বলা হয়েছে, হজরত মোহাম্মদ ঈশ্বরের শেষ নবী। কথাটা হঠকারী মনে হতে পারে। কিন্তু অন্য একভাবেও কথাটা ব্যাখ্যা করা যায়। ইসলামকে মোহাম্মদ দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন যুক্তির যুগের সীমায়। ভবিষ্যতে নূতন করে কেউ নবী হবেন না, অগ্রসর হতে হবে গৃহীত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের সঙ্গে যুক্তির মিলন ঘটিয়ে।"

এই অনুচ্ছেদটি যত্ন করে পড়লে আত্মসংবরণ করা কঠিন হয়। অম্লানবাণী আল্লার বাণীর সমান কিনা জানি না, কিন্তু এখানে এই মান্য অধ্যাপক 'শেষ নবীত্ব' সম্বন্ধে আল্লার বাণীর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে তাঁকে আল্লার সমান না হোক, জিব্রাইল ফিরিশ্‌তার সমান বলেই মনে হয়; পয়গম্বরের নবাবতার না হোক, 'মুজাদ্দিদ'দের ('মুজাদ্দিদ'=ইসলামের নবজন্মদাতা) চূড়া বলেই মনে হয়; পীরকুলের পুঙ্গব না হোক, 'মুরশেদ'কুলের (=গুরু) কোহিনূর বলেই মনে হয়। 'দেশ' পত্রিকার পাতা এমন কোহিনূরের স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে, একথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, বিশ্বাস করার পরে দেহমন আনন্দেতে পুলকিত হয়, পুলকিত হওয়ার পরে গলা ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে হয় "মোধো তোর পেটে এতও ছিল।"

কেননা ইসলামে শেষ নবী মানে শেষ নবীই, তিনি (মুসলমানের চোখে) আধ্যাত্মিক যুগেরও শেষ, যুক্তির যুগেরও শেষ, বুদ্ধির যুগেরও শেষ। অম্লান দত্তের ইসলামী যুক্তিপন্থার সঙ্গে কোরানের সম্বন্ধ অল্পই। তিনি যদি কোনো মৌলবীর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন তো অনায়াসে জানতে পারতেন আল্লা 'শেষ নবী' ঘটিত বাণীটা পাঠিয়েছিলেন পয়গম্বরের একটা বিতর্কিত বিবাহের প্রসঙ্গে;—ওতে

[17]স্বীকার করা উচিত মৌলানা মাজাহারউদ্দীনের এই বিবরণগুলির উল্লেখ আমি কোরান-হাদিসে খুঁজে পাইনি। তবে "পর্বতের উপর কোরান নামালে পর্বত ফেটে চৌচির হয়ে যাবে"—এই কোরানবাণী মৌলানার বাণীগুলির চেয়ে কম রোমহর্ষক নয়।

আধ্যাত্মিকতার কোনো প্রস্তাব ছিল না, আধ্যাত্মিক যুগের শেষে যুক্তির যুগের প্রস্তাব তো নয়ই। আসলে পয়গম্বর আল্লার প্রত্যাদেশ পেয়ে তাঁর পোষ্যপুত্র (এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস) জায়েদের পত্নী জয়নাবকে (তালাকের পর) বিয়ে করেছিলেন, তাইতেই মদিনাবাসীদের মধ্যে একটা সমালোচনার গুঞ্জন উঠেছিল। তখন আল্লা বাণী পাঠান :

আল্লা আর রসুল যখন কোনো একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন তারপর 'মোমিন' পুরুষ আর 'মোমিন' মেয়েদের তা নিয়ে কোনো আলাদা সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না। (কো ৩৩.৩৬, অনুবাদ স্বচ্ছন্দ)

এর পরের আয়াতে আল্লা বলেন :

পয়গম্বরের এই বিয়ে আমিই দিয়েছি, এরপর থেকে যে কোনো 'মোমিন' এই রকম বিয়ে করতে পারবে (কো ৩৩|৩৭)। [অর্থাৎ পোষ্যপুত্রের বৌকেও তালাকের পর বিয়ে করতে পারবে]

এর পরের আয়াতে বলেন : আল্লা নবীর জন্য যে বিধান দেন ঐটেই ঠিক। আগের নবীদের ক্ষেত্রেও ঐটেই ছিল আল্লার শাসনপদ্ধতি। (কো ৩৩। ৩৮)

এর পরের আয়াতে বলেন : নবীরা আল্লার বাণীই প্রচার করে আর কিছু করে না—কেননা (আর কিছু করতে চাইলে) আল্লা হিসাব চুকিয়ে দেন। (কো ৩৩|৩৯)

এর পরের আয়াতে বলেন :

এই নবীধারার শেষ হয়েছে মোহাম্মদে এসেই। সে তোমাদের মধ্যে কারো পিতা নয় (জায়েদের তো নয়ই)। সে নবীধারাকে 'খতম' করেছে (কো ৩৩|৪০)। [মূলে আছে 'খাতিম্-উন্-নবীঈন']

এই স্বচ্ছন্দ অনুবাদের সাহায্যে পুরো আলোচনাটা ধাপে ধাপে হৃদয়ঙ্গম করলে বোঝা যায়, শেষ নবীত্বের বাণী এসেছিল মদিনাবাসীদের একটা অশোভন বিতর্কের মুখ চাপা দেবার জন্যই; পয়গম্বরের বিতর্কিত বিশেষ উদ্দেশে বিতর্কহীন আনুগত্যের প্রচারের জন্যই; এবং (আধ্যাত্মিক হোক, বৈবাহিক হোক) সবরকম ব্যাপারেই ইসলামের বিচারহীন আল্লানিষ্ঠা, বিচারহীন কোরান-নিষ্ঠা এবং বিচারহীন পয়গম্বরনিষ্ঠা পাকা করবার জন্যই। শেষ-নবীত্বের ঘোষণা মানে 'আধ্যাত্মিক যুগের শেষে যুক্তিবুদ্ধির যুগপ্রতিষ্ঠা'—এই তত্ত্ব পুরোপুরি অধ্যাপক অম্লান দত্তের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত অশ্বডিম্ব—কোরানের ইসলাম এ তত্ত্বের কোনো ধার ধারে না।[18]

তাছাড়া কথাটা নিয়ে তর্কবিতর্কেরও সুযোগ নেই। সারা পৃথিবীর লোক জানে, ইসলামের 'শেষ নবী' তত্ত্ব তার ধর্মান্ধতার একটা মস্তবড় দিক—এরজন্য রক্তপাত শুরু হয় ইসলামের আদিযুগ থেকেই। এই সেদিনও পাকিস্তানে আহমদীয়া গোষ্ঠীকে (তারাও মুসলমান) শুধু এই 'শেষ নবী' তত্ত্বে সম্যক বিশ্বাসী না হওয়ার জন্য গণহত্যার তাণ্ডব চালিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। এরই জন্য ইসলামে কোরান-ব্যাখ্যার নিয়ামক হয়েছে 'শেষ নবী'র বাণী (হাদিস), তার ফলে কোরানের স্বাধীন বিচার মুসলমানের পক্ষে কার্যত অসম্ভব হয়েছে। প্রকারান্তরে এরই জন্য সলমন রুশদী নামক হতভাগ্য লেখকের বিরুদ্ধে মরণ ফতোয়া বেরিয়েছে এবং সে উপলক্ষে রক্তপাতও হয়েছে বিস্তর। যে বিদ্বান এই সমস্ত সুবিদিত, প্রত্যক্ষদৃষ্ট এবং সর্বত্র-আলোচিত তথ্যের দিকে তাকিয়ে গাঁজাখোরের ভঙ্গিতে 'শেষ নবী' তত্ত্বকে যুক্তিবাদের জয়-ঘোষণা বলে জাহির করে, তার যুক্তিবুদ্ধির ধারণা সম্বন্ধে আমাদের মতো অবিদ্বান্ কী বলবে? এইটুকুই বলবে যে, এই বিদ্বানের বোধ হয় পেট গরম হয়েছে, ইসলামভক্তির আতিশয্যে ইনি বোধ হয় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানের জলাঞ্জলি দিয়েছেন, ইনি বোধ হয় এক নূতন যুক্তিবাদের ঝান্ডা উড়িয়ে 'শেষ পয়গম্বরে'র পরে 'অশেষ পয়গম্বর' রূপে আত্মপ্রকাশ করতে মনস্থ করেছেন।

---

[18]এই অশ্বডিম্বের আরেকটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'দেশ' পত্রিকার পাতায়, অম্লান দত্তের প্রবন্ধের প্রশংসায়, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটা চিঠি। তিনি 'ইজ্‌তিহাদ' (=শাস্ত্রীয় যুক্তি) নামে আরবি শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন 'স্বাধীন যুক্তিবাদ' বলে। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উপসংহার : কয়েকটি সিদ্ধান্ত

কোয়ানটাম থিয়োরি সম্বন্ধে সদ্যোজাত শিশুর যে জ্ঞান, ইসলাম সম্বন্ধে অম্লান দত্তের জ্ঞান তার চেয়ে বেশি নয়। 'দেশ' পত্রিকায় ছাপা ইসলাম-সংক্রান্ত পণ্ডিতম্মন্য লেখাটিতে তিনি কোরানের দুটো তিনটে আয়াত উদ্ধৃত করেছেন; উহুদ যুদ্ধের নাম করে ইঙ্গিতে জানিয়েছেন পয়গম্বরের জীবনী সম্বন্ধেও তিনি ওয়াকিবহাল; সূত্র উল্লেখ না করে কয়েকটা হাদিসের খবর দিয়ে বুঝিয়েছেন "মুহাদ্দেস" (হাদিস-শাস্ত্রজ্ঞ) হিসাবেও তিনি কম যান না। কিন্তু অভিজ্ঞ পাঠক অতি সহজেই বুঝতে পারেন, ইসলামের প্রামাণিক পরিচয় হিসাবে এগুলির দাম সদ্যোজাত শিশুর আধো-আধো প্রলাপের চেয়ে বেশি নয়। এই প্রলাপের জোরেই তিনি ইসলাম-বিশেষজ্ঞ সেজে 'দেশ' পত্রিকায় গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ ফেঁদেছেন। এরই ভরসায় তিনি হিন্দুসমাজের দৃঢ়বদ্ধমূল বৈষম্যের সঙ্গে তুলনা করে ইসলামী সাম্যবাদের স্তুতিগানে বিগলিত হয়েছেন, এরই পুরস্কার হিসাবে তিনি ঐ কাগজের চিঠিপত্রের পাতায় তাঁরই মতো একসারি ইসলামবিশেষজ্ঞের প্রশংসাভরা চিঠির দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন। এর থেকে কয়েকটা সিদ্ধান্ত না করে পারা যায় না।

প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে, অধ্যাপক অম্লান দত্তের এই 'পণ্ডিতম্মন্য' রচনা এবং এর উদ্দেশে কাগজী ইসলামবিশেষজ্ঞদের প্রশংসাভরা কলকাকলি বাঙালী বিদ্বানসমাজের মুখে চুনকালি লেপে দিয়েছে। কাগজী প্রশংসাকারীদের কথা ধর্তব্য নয়, কেননা কাগজে চিঠি ছাপাতে হলে কাগজী প্রবন্ধের গুণগান করাই নিয়ম। কিন্তু যে লেখক কোরান-হাদিসের কোনো চর্চাই করেননি, তিনি ইসলামের স্তুতিগান লিখেছেন 'অথরিটির' ভঙ্গিতে—কোনো কিছুই না জেনে শুনে, মস্ত-মস্ত ঐস্লামিক তত্ত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্তবাক্য জাহির করেছেন অকুতোভয়ে,—হিন্দুসমাজকে লাঞ্ছিত করেছেন Comparative Religion-এর মহাবিশেষজ্ঞের কায়দায় এতগুলি অপকর্ম, প্রবন্ধের শুরুতে কপট বিনয়ের ভড়ং দেখালেই, ক্ষালন হতে পারে না। "আমার পড়াশুনো অল্প কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে আমার প্রগাঢ় সহানুভূতি আছে।"—এই বিনয়বাক্যের পরে পাঠককে তিনি কতকগুলি অপসিদ্ধান্তই গেলাতে চেয়েছেন, কোনো অজুহাতেই এরকম কুকর্মকে সমর্থন করা যায় না।

দ্বিতীয়ত এরকম প্রবন্ধের লেখক ইসলামের বন্ধু হতে পারেন, কিন্তু কোনো ভাবেই তিনি ইসলামপীড়িত সাধারণ মুসলমানের বন্ধু নন। ইসলামের ধর্মান্ধতা এবং অসহিষ্ণুতার প্রমাণ সাম্প্রতিক ভারতে দিনে-দিনে এত বেশি সংখ্যায় পুঞ্জীভূত হচ্ছে যে ঐ মতবাদের জেলখানায় বন্দী সাধারণ মুসলমানের অসহায়তা এখন আর তল্লাসি করে জানতে হয় না—যে কেউ এই অসহায়তা দেখতে পায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে এর অনেক নাটকীয় প্রমাণ চারদিকেই প্রকাশ পাচ্ছে। পুরুষদের ক্ষেত্রে অন্তত এটুকু বোঝা যাচ্ছে, ইসলামে প্রতিবাদী হওয়ার শাস্তি কী ভয়ঙ্কর! এই ইসলামকে 'সর্বমানবিক', 'সাম্যবাদী', 'যুক্তিবাদী' প্রভৃতি আজগুবি বিশেষণে বিশেষিত করলে প্রত্যেকটি ইসলামপীড়িত মুসলমানের সঙ্গে বেইমানি করা হয় এবং প্রতিবাদী মুসলমানের বিপদ আরো বাড়ানো হয়। দৃষ্টান্ত

হিসাবে বলা যায়, অম্লান দত্তের প্রবন্ধ তসলিমা নাসরিনের মতো প্রতিবাদী মানুষের বিপদ বাড়াবে। তাঁর অসার প্রবন্ধের আজগুবি সিদ্ধান্তগুলি যদি কেউ সত্য বলে বিশ্বাস করে তবে সে অবশ্যই বলবে : 'তসলিমার মতো পাষণ্ডেরাই ইসলাম সম্বন্ধে মিথ্যে বদনাম রটিয়ে বেড়াচ্ছে, এদেরকে কড়া শাস্তি দেওয়া উচিত এবং অম্লান দত্তের মতো ইসলামবন্ধুকে দেওয়া উচিত খেলাত আর আশ্‌রফি'। অর্থাৎ অম্লান দত্তের মতো 'সেকুলার হিন্দু' এই ধরনের প্রবন্ধ লিখে ধর্মান্ধ মোল্লাদেরই জোর বাড়াচ্ছেন,—এই অপকর্মের তুলনা হয় না।

তৃতীয় সিদ্ধান্তটা দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত থেকেই বেরিয়ে আসে। অম্লান দত্তের মতো লেখকরা যেমন ইসলামের ফাঁসকল থেকে মুক্তিকামী ও প্রতিবাদী মুসলমানের বন্ধু নন, তেমনি আগ্রাসী ইসলামের বোমাবাজিতে কাতর হিন্দু সমাজেরও মহাশত্রু। তাঁর 'দেশ' পত্রিকার লেখাটায় যেভাবে ধ্যানগম্ভীর সুরে হিন্দুসমাজের তথাকথিত দৃঢ়মূল বৈষম্যের সঙ্গে ইসলামের তথাকথিত সাম্যবাদের গুণগান করা হয়েছে তার অনিবার্য ইঙ্গিত হচ্ছে আমাদের আজ হিন্দুসমাজ ছেড়ে কল্‌মা পড়াই উচিত। এই ইঙ্গিতকে তিনি বাক্যের আকারে রূপ দেননি ঠিকই, কিন্তু ইসলামের আগ্রাসী ও বোমাবাজ মূর্তি যখন ভারতের প্রতিটি অঞ্চলে দাঁত-নখ বের করে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছে, ঠিক সেইসময় হিন্দুর ধর্মকর্মকে হেয় করে ইসলামের স্তুতিবাদের আর কোনো তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এইজন্য অনুমান করছি অধ্যাপক অম্লান দত্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চান, "বৈষম্যবাদী ও সর্বদানবিক হিন্দুসমাজ ছেড়ে হিন্দুদের আজ দলে দলে সাম্যবাদী ও সর্বমানবিক ইসলামের শরণাপন্ন হওয়াই উচিত; কল্‌মার জন্য নাখোদা বা আর কোনো মসজিদের দিকে ধাবিত হওয়াই উচিত।"—এ সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই বলব যে, হয়তো উচিত, কিন্তু তার আগে জানা উচিত হিন্দুনামের আড়ালে থেকে এই প্রবন্ধ-লেখক নিজে কল্‌মা পড়ে 'মোমিন' হয়েছেন কিনা। তা যদি তিনি না হয়ে থাকেন তবে সকলের আগের সেই ত্রুটিটাই সংশোধন করা উচিত। আর তা যদি তিনি হয়ে থাকেন তবে তাঁর হিন্দু নামটা পাঠক সমাজের উদ্দেশে জাহির করাকে প্রতারণা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তাঁর পক্ষে 'শামস-উদ-দীন' কিংবা 'বদর-উল-ইসলাম' নাম ধারণ করলেই সততার পরিচয় দেওয়া হবে। 'অম্লান দত্ত' নামের চেয়ে 'ইসলামের পূর্ণচন্দ্র' বা 'পূর্ণসূর্য' নামই এরকম প্রবন্ধের লেখকের পক্ষে মানানসই। [বদরুদ্দীন=ধর্মের পূর্ণচন্দ্র; শামসুদ্দীন=ধর্মের পূর্ণসূর্য]

পুনশ্চঃ 'দেশ' পত্রিকার প্রবন্ধে অধ্যাপক অম্লান দত্তের কল্‌মা ঘটিত ব্যাকুলতা নানাভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। 'শেষ নবী'-তত্ত্বকে তিনি যেভাবে অভিনব ব্যাখ্যা দিয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, তার পরে তাঁর 'হেদায়েতে'র (=সৎপথগামী হওয়ার=কল্‌মা দীক্ষা নেওয়ার) অপরিহার্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না। ইসলামের এই ধরনের প্রশংসাবাদ কখনো ধর্মদীক্ষালাভের সঙ্কল্প ছাড়া করা যায় না—করতে চাইলেও ইসলামী রাষ্ট্র তাকে মুসলমান না করে ছাড়ে না। এ সম্বন্ধে একটা প্রামাণিক কাহিনী অম্লান দত্তের মতো সেকুলার হিন্দুদের জানা উচিত।

সুলতান ফিরোজ-শা-তুঘলকের আমলে এক নামজাদা সুফী ছিলেন শেখ জালাল-উদ্‌-দীন বোখারি মাখদুম-ই-জাহানিয়াঁ। এই পীরসাহেব ১৩৮৪ খ্রীস্টাব্দে মারা যান। মারা যাওয়ার আগে তাঁর রোগমুক্তি কামনা করতে গিয়েছিলেন এক হিন্দু দারোগা, তাঁর নাম নবাহন (Nawahun)। নবাহন ভদ্রতা করে বলেন, "মহম্মদ যেমন আল্লার শেষ নবী, আপনি তেমনি আল্লার শেষ পীর।" মৃত্যুশয্যাশায়ী পীরসাহেব সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন "তুমি কল্‌মার আদ্দেক[19] পড়েছ, কাজেই তোমাকে মুসলমান হতেই হবে।" নবাহন একথা মানতে পারলেন না। তখন শেখ জালাল-উদ্‌-দীন বললেন "তুমি মুর্তাদ (apostate) হয়ে গেছ—তোমার সাজা মৌৎ" (=মৃত্যু)। নবাহন ভয় পেয়ে সুলতানের আশ্রয় নিলেন—সুলতান তাঁকে তখনকার মতো অভয় দিলেন—এদিকে পীরসাহেবও

[19]কল্‌মা: "আল্লা ছাড়া দেবতা নেই, মহম্মদ সেই আল্লার রসুল"।

'ইন্তেকাল' করলেন। কিন্তু নবাহনও নিজের মৃত্যু ঠেকাতে পারলেন না। পীর সাহেবের ভাই সদর-উদ্-দীন রাজু কাট্টাল সুলতানের দরবারে গিয়ে নানা ইসলামী যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করলেন নবাহন সত্যিসত্যিই ইসলাম থেকে মুখ ফেরানো 'মুর্তাদ'। তখন পরমধার্মিক সুলতান তাঁকে জল্লাদের হাতে তুলে দিলেন।[20]

অধ্যাপক অম্লান দত্তের মতো 'সেকুলার হিন্দু'রা এই প্রামাণিক কাহিনীটা থেকে কিছু শিক্ষা নিলে ভালো করবেন। ধার্মিক মুসলমানের চোখে তাঁরা অনেকেই 'হেদায়েৎ' পাওয়া মুসলমান হয়ে গেছেন—তাঁদের হিন্দু নামটা ছলনা মাত্র।

[20]ঐতিহাসিক K. S. Lal এই কাহিনীটা তাঁর 'The Legacy of Muslim Rule in India' বই-এ উদ্ধৃত করেছেন।

পরিশিষ্ট (১): 'সেকুলার পত্রিকার কীর্তি'

অধ্যাপক অম্লান দত্তের অসার, ইসলাম তোষক এবং হিন্দুবিদ্বেষী লেখাটা 'দেশ'-পত্রিকায় ১৮|৬|৯৪ তারিখে ছাপা হয়।

২৯|৬|৯৪ তারিখে আমি এর একটা প্রতিবাদপত্র লিখে পাঠাই। 'দেশ' এই প্রতিবাদপত্র ছাপায়নি, কিন্তু প্রশংসাপত্র ছাপায় অনেকগুলি। এইজন্য আমার চিঠির প্রথম ভাগটা এখানে তুলে ধরছি, এবং 'সেকুলার হিন্দু'দের মুখপত্র 'দেশ'-এ এটা না ছাপানোর আনুমানিক কারণটা ব্যাখ্যা করছি। আমি লিখেছিলাম :

২৯|৬|৯৪

সবিনয় নিবেদন,

১৮|৬|৯৪-এর 'দেশে' অধ্যাপক অম্লান দত্ত যে ভুল কথার পাঁচালি গেঁথেছেন তা আদৌ বিবেচ্য হত না। কিন্তু তিনি যখন হিন্দুসমাজের সঙ্গে তুলনা করে ইসলামের গুণগান করেন তখন দুয়েকটা কথা বলতেই হয়। তিনি বলেন :

"হিন্দু সমাজে অসাম্য যেমন শাস্ত্রীয় অনুমোদন লাভ করেছে, দৃঢ় আচারের দ্বারা উচ্চনীচ-ভেদাভেদ সুরক্ষিত হয়েছে—মুসলমান সমাজে তেমন হয়নি।"

অম্লান দত্তের কথা সত্য নয়।...হিন্দুসমাজের বৈষম্য নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর, কিন্তু "ভ্রাতৃত্ববাদী" ইসলামে যেমন আল্লাকেই বৈষম্যের দেবতা বানানো হয়েছে হিন্দুদের মধ্যে ওরকম বৈষম্য অকল্পনীয়। সূরা মহম্মদের ১১নং আয়াতে আছে, আল্লা শুধু মুসলমানেরই রক্ষক, বিধর্মীর কোনো রক্ষক নেই (কো ৪৭|১১)। কোরান অমুসলমানকে বলেছে 'অভিশপ্ত', পৌত্তলিককে বলেছে 'জঘন্যতম জন্তু' (কো ৯৮|৬) বিধর্মী কাফেরের জন্য তার পাকা ব্যবস্থা হচ্ছে অনন্তকাল স্থায়ী নরককুণ্ড।

তথাকথিত ভাই-ভাইদের মধ্যেও ইসলাম কোনো সাম্যের ব্যবস্থা রাখেনি। এমনকি এই বৈষম্যের জন্যও সে আল্লার দোহাই দিয়েছে। কো ১৬|৭১ এ সে 'ডান হাতের মালিকানাধীন' দাসেদের সঙ্গে মনিবের বৈষম্যকে 'আল্লার অনুগ্রহ' বলে উল্লেখ করেছে। বৈষম্যের অতখানি 'শাস্ত্রীয় অনুমোদন' কি অম্লান দত্ত কোন হিন্দুশাস্ত্র থেকে দেখাতে পারেন? হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্যতার মতো মহাপাপ আছে, কিন্তু তিনি কি দেখাতে পারবেন, অস্পৃশ্যতা 'ভগবানের করুণা' বলে কোনো শাস্ত্রে লেখা আছে?

পূর্বোক্ত 'ডান হাতের মালিকানাধীন দাসদাসী' কথাটা কোরানের সবচেয়ে জনপ্রিয় স্লোগান। এর থেকে জেহাদে কেড়ে আনা মেয়েদের যথেচ্ছ উপপত্নী হিসাবে ভোগ করার ব্যবস্থা কোরান শুধু মেনেই নেয়নি, সেটাকেও আল্লার বিধান হিসাবে জারি করেছে। সূরা নিসার ২৪নং আয়াতের প্রথমেই আছে : "সধবা নারী অবৈধ, কিন্তু তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহাদের উপর অধিকার স্থাপন করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে আল্লা লিপি করিয়াছেন' (কো ৪|২৪) পিক্টহলের অনুবাদে আছে This is a decree of Allah for you। অম্লান দত্ত কি এটাকেও 'ইসলামী সাম্যের দৃষ্টান্ত' বলতে চান?

দাসপ্রথা ইসলামের আগেও ছিল কিন্তু ইসলাম ওটাকে যে বিশাল ব্যাপারে পরিণত করে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা নেই। তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখাতে পারি আমেরিকায় যে নিগ্রোদাসের ব্যবসা সারা দুনিয়ায় ঘৃণিত হয়, এবং দাসপ্রথা লোপের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তারও middlemen ছিল আরবরা, তাদের বলত স্লেভ ক্যাচার। সউদী আরবে এখনো (প্রচ্ছন্ন) দাসপ্রথা আছে, আর কোনো দেশেও, বাইরের চাপে না পড়ে, ইসলাম থেকে দাসপ্রথা যায়নি। আমিনা প্রভৃতি মেয়ের কথা অম্লান দত্তও কাগজে পড়ে থাকবেন। আরবরা এদের কিনে নিয়ে দাসী হিসাবেই খাটায় এবং উপপত্নী হিসাবেই ভোগ করে। ইসলামী সাম্যবাদ এই রকম।

বিনীত

সুহাস মজুমদার।

কেন এ চিঠি 'দেশ' পত্রিকার কর্ণধারবর্গ ছাপলেন না? মূল চিঠিটা এর চেয়েও বড় ছিল—'দেশ' ঐ চিঠির অংশবিশেষ মাত্রও কাটছাঁট করে ছাপায়নি। বলা বাহুল্য অম্লান দত্তের ইসলামী সাম্যঘটিত অপ্রামাণিক গালগল্প আমার চিঠির কোরান-নিষ্ঠ ও ইতিহাস-নিষ্ঠ যুক্তিতর্কের ধাক্কায় চুরমার হবার আশঙ্কা ছিল। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী হয়তো ভেবে থাকবেন ও চিঠি ছাপলে তাঁরা ঐ এক ধাক্কায় চুরমার হয়ে যাওয়া মূল প্রবন্ধের জন্যই হাস্যাস্পদ হবেন। হয়তো এই কারণেই তাঁরা চিঠিটা ছাপাননি।

কিন্তু অন্য কারণও থাকা সম্ভব। ইসলামের গুণকীর্তন এবং হিন্দুর অন্যায় নিন্দা সমস্ত সেকুলার পত্রিকার অভ্যাস, সেকুলার 'দেশ'ও ঐ অভ্যাস ছাড়তে পারে না। সেও ইসলামপ্রেমে আতুর হয়ে হিন্দুবিদ্বেষ দেখিয়েই 'সেকুলারিজম' ফলাতে চায়। হয়তো এই জন্যই সে চিঠিটা ছাপায়নি।

কিন্তু কাজটা যে সে অত্যন্ত গর্হিত কাজই করেছে সে কথা সকলের বোঝা উচিত। "অমুকবিষয়ে কোনো চিঠিপত্র ছাপা হবে না।"—এই মন্তব্য যে কোনো সম্পাদকই করতে পারেন, ঐটে তাঁর প্রিভিলেজ, কিন্তু কতকগুলি প্রশংসাপত্র যদি তিনি ছাপান, তবে প্রতিবাদপত্র ছাপানো তাঁর নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বিশেষ করে কল্‌মার জন্য লালায়িত অম্লান দত্ত হিন্দু সমাজকে যে বিশ্রী ও অন্যায় গালিগালাজ করেছেন তার প্রতিবাদের সুযোগ না দিলে 'দেশ'-এর সম্পাদককেও কল্‌মা-প্রচারক ভাবার কারণ দেখা দেয়।

পরিশিষ্ট (২) : 'ইজ্‌তিহাদ' কাকে বলে?

'সেকুলার' 'দেশ-পত্রিকা' ১৮/৬/৯৪ সংখ্যায় ছাপা অম্লান দত্তের অসার প্রবন্ধের জবাবে ১০/৯/৯৪ সংখ্যায় একগোছা চিঠি ছাপায়। শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠিকে তার মধ্যে বসানো হয় প্রথম স্থানে। শৈলেশবাবু হ্রস্ব-দীর্ঘের জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়ে সাষ্টাঙ্গপ্রণত মোসাহেবের ভঙ্গিতে জানান :

"অম্লানবাবুর মতো সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিন্তক যে বক্তব্যের সূত্রপাত করলেন, বাঙালী মুসলমানদের ভিতর তা ইসলামের অমূল্য বিধান ইজ্‌তিহাদ-ইজমার শরণ নিতে তাদের উদ্বুদ্ধ করুক, এবং পশ্চিমবঙ্গে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের মতো এমন কোনো আন্দোলন গড়ে উঠুক—যা ভারতের ইসলামকে তার শুদ্ধ স্বরূপে স্বপ্রতিষ্ঠ করার সঙ্গে সঙ্গে এই সর্বমানবের সর্বাঙ্গীন ধর্মকে যুগের প্রয়োজনে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনে প্রেরিত করুক।"

এই প্রশংসাপত্র বড় আশ্চর্য। একটা আদ্যন্ত মিথ্যায় ভরা অসার প্রবন্ধের লেখক সম্বন্ধে কেউ অতখানি মোসাহেবি করতে পারে তা আমাদের জানা ছিল না। অম্লান দত্ত কোন স্তরের 'চিন্তক' তার সবিস্তার পরিচয় আমি এ পুস্তিকায় দিয়েছি। কাজেই শৈলেশবাবুর খোসামুদে ভঙ্গি সম্বন্ধে আর কোনো মন্তব্য না করে, তাঁর একটা কথা সম্বন্ধেই এখানে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

কথাটা হচ্ছে 'ইজ্‌তিহাদ'। এই আরবি শব্দটার অর্থ 'শাস্ত্রানুসারী যুক্তিতর্ক'। শৈলেশবাবু এটাকে 'স্বাধীন যুক্তিবাদ' অর্থ ধরে তাঁর মস্তবড় চিঠিতে ইসলামের যে মর্মগত বিচারধর্মিতার গুণগান করেছেন এবং আধুনিক ভারতের মুসলমানকে তারই শরণ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, 'ইজ্‌তিহাদ' সম্বন্ধে অতবড় কথা অম্লান দত্তও তাঁর হঠকারী প্রবন্ধে বলতে সাহস করেননি। তিনিও ইসলামের যুক্তিবাদের কথা বলতে গিয়ে লোক হাসিয়েছেন সন্দেহ নেই এবং একজায়গায় ইজ্‌তিহাদের কথাও উল্লেখ করেছেন কিন্তু এই ইসলামী পরিভাষার এমন অত্যাশ্চর্য ব্যাখ্যা দিতে তিনিও কুণ্ঠা বোধ করেছেন। শৈলেশবাবু প্রলাপ বকেছেন অকুণ্ঠে অলজ্জায় এবং অবলীলায়।

T. P. Hughes তাঁর প্রামাণিক Dictionary of Islam বই-এ 'ইজ্‌তিহাদের' অর্থ লিখেছেন The logical deduction on a legal or theological question by a mujtahid or learned and enlightened doctor। সোজা কথায়, "ইসলামী ধর্মতত্ত্ব বা শরীয়তী বিধানের কোনো বিশেষ প্রসঙ্গে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের যুক্তিসম্মত অনুসিদ্ধান্তকেই 'ইজ্‌তিহাদ' বলে। এর মধ্যে পাগল ছাড়া কেউ স্বাধীন যুক্তিবাদের মূল খুঁজতে যাবে না।

Hughes 'ইজ্‌মা'র ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি বলেন Ijma is The collective opinion of a council of divines অর্থাৎ 'ইজ্‌তিহাদ' একলা পণ্ডিতের শাস্ত্রানুসারী যুক্তি আর ইজ্‌মা বহু উলেমার 'সম্মিলিত' মত। শৈলেশবাবুর স্বাধীন যুক্তিবাদ ইজ্‌মাতেও নেই। এর মধ্যে স্বাধীন যুক্তির সুযোগ আরো কম।

হিউইস-এর এই আলোচনা পড়ে ইজ্‌তিহাদের স্বরূপ বুঝতে আমাদের কোনো কষ্ট হয় না। এর সঙ্গে স্বাধীন যুক্তিতর্কের কোনো সম্বন্ধই নেই। স্বাধীন যুক্তিতর্ক নয়—শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কই ইজ্‌তিহাদের

প্রাণ—এর দ্বারা ইসলামের কোনো শাস্ত্রীয় বিধানকে চ্যালেঞ্জ করা বা তার প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়,—ইজ্‌তিহাদের দ্বারা সেরকম প্রতিবাদের কোনো নজির শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বা আর কোনো লেখক দেখাতে পারেননি।

ইজতিহাদ আর তকলিদ : শৈলেশবাবুর মহাভুল এই যে, ইসলামের একটা আভ্যন্তরিক তর্ককে 'ইজ্‌তিহাদ' বনাম 'তকলিদের' তর্ককে—তিনি 'যুক্তিবাদ' বনাম 'শাস্ত্রবাদের তর্ক' ভেবে লোক হাসিয়েছেন। তকলিদ কথাটার মানে কোনো ইসলামী ধর্মগুরু বা বিধানদাতার প্রতি অন্ধ আনুগত্য (The following of a religious leaders without due enquiry—T. P. Hughes)। পণ্ডিতেরা জানেন আবু হানিফা প্রভৃতি 'মজহব' প্রতিষ্ঠাতা বিধানদাতাকে সুন্নী ইসলামে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। 'মজহব' মানে 'বৈধানিক সম্প্রদায়'—সুন্নীদের মধ্যে এরকম চারটে সম্প্রদায় আছে। কিন্তু কেউ যদি মজহবগুলির একটাকেই অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে এবং অন্য মজহবগুলির বিধানকে ইসলাম বিরুদ্ধ বলে হল্লাগল্লা করে তবে সেরকম গোঁড়ামিকে 'তকলিদ' বলে। ইসলামে সবযুগেই এই তকলিদের প্রতিবাদে এক ধরনের 'ইজ্‌তিহাদের' ধারা চলে এসেছে, সেটা সবগুলি 'মজহব'কেই সম্মান করার ধারা। শৈলেশবাবু ভেবেছেন ওটা গোঁড়ামির বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধির ধারা। বলা বাহুল্য ওটা তা নয়। 'তকলিদ'-বিরোধী উলেমার ধর্মান্ধতা অনেক সময় 'তকলিদী' উলেমার ধর্মান্ধতাকে ছাপিয়ে যায়। এইরকম ধর্মান্ধ 'ইজ্‌তিহাদের' দৃষ্টান্ত ইসলামে সবযুগেই পাওয়া গেছে। ভারতে এর মস্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে গো-হত্যার ইজ্‌তিহাদ।

অভিজ্ঞ পাঠক জানেন, কোরান হাদিসে কোথাও গোহত্যার অবশ্যকর্তব্যতার বিধান দেওয়া হয়নি। অথচ ভারতে এটা অবশ্যকর্তব্যের মর্যাদা পেয়েছে। যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে এই বিধানের আদিগুরু বলা যায় তিনি আকবরের সমসাময়িক মোল্লা শেখ আহমদ শিরহিন্দী (১৫৬৪-১৬২৪)। এঁর ইজ্‌তিহাদের (শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রয়োগ) ধরনটা উল্লেখযোগ্য।

শিরহিন্দী বলেন : ভারতের হিন্দুরা কাফেরও 'জিম্মি'। তাদের অপমান করাই ইসলামের বিধান। গোরুকে হিন্দুরা মায়ের মতো সম্মান করে কাজেই গোহত্যাই তাদের অপমান করার প্রশস্ততম উপায়। অতএব অন্যত্র যাই হোক "Cow killing in India is the noblest of Islamic sacrifices।" এইটেই ভারতীয় ইসলামের সবচেয়ে সুপ্রসিদ্ধ 'ইজ্‌তিহাদ'।[21]

শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেণীর পণ্ডিতমূর্খকে নিয়ে মুশকিল এই যে, ইসলামের কোনো তত্ত্ব সম্বন্ধেই ভালো ভাবে না জেনে তাঁরা এই শ্রেণীর ধর্মান্ধতাকে 'বুদ্ধির মুক্তি' বলে প্রশংসাপত্র দিয়ে থাকেন। ব্যাপারটা আশ্চর্য নয়। গোহত্যার ইজ্‌তিহাদকে 'বুদ্ধির মুক্তি' বলে চালালে হিন্দুর ধ্যানধারণাকে যথেষ্ট তেজের সঙ্গে পদাঘাত করা যাবে এবং সেই সঙ্গে ইসলামপ্রেমও দেখানো যাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। এইটেই তাঁর মতো 'সেকুলার হিন্দুর' মনের কথা। এইজন্য অম্লান দত্তের মতো অসার লেখককেও 'সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিন্তক' বলা—এই জন্যই অন্ধ উন্মাদনাময় ইসলামকে 'সর্বমানবের সর্বাঙ্গীন ধর্ম' বলে জয়জয়কার করা। শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অম্লান দত্ত সেকুলার হিন্দু গোষ্ঠীর মানিকজোড়, খুব সম্ভব এঁদের মোসাহেবি-ও পারস্পরিক। "সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিন্তক" অম্লান দত্তের উদ্দেশে শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মোসাহেবি আমরা দেখেছি। অদূর ভবিষ্যতে, 'সর্বজনশ্রদ্ধেয় চিন্তক' শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে অম্লান দত্তের মোসাহেবিও আমরা দেখতে পাব এমন বিশ্বাস যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু সেই যুক্তিকে "ইজ্‌তিহাদ" বলা যাবে কি না তা নিয়ে তর্কের সুযোগ আছে।

---

[21]সম্প্রতি(১৯৯৪) Muslim Personal Law Board এর চেয়ারম্যান আলী মিঞা আবুল হাসান আলী নাদভী শিরহিন্দি এই 'ইজ্‌তিহাদের' সমর্থনে লেখালেখি করেছেন।

পরিশিষ্ট (৩) : সেকুলার পত্রিকার সত্যনিষ্ঠা

প্রথম পরিশিষ্টে আমি দেখাতে চেয়েছি 'দেশ' পত্রিকা 'সেকুলার হিন্দুর' পত্রিকা বলেই অম্লান দত্তের হিন্দুবিদ্বেষ প্রসূত ইসলাম-প্রেমময় মিথ্যার পাঁচালিটা ছাপিয়েছে, কিন্তু একই কারণে, ঐ মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে, আমার প্রতিবাদপত্রটা ছাপায়নি। অনেক 'দেশ'-প্রেমিক পাঠক আমার কথায় অবিশ্বাস করবেন, কেননা আমার ২৯/৬/৯৪-এ লেখা চিঠি না ছাপালেও সেপ্টেম্বর মাসে লেখা আমার আরেকটা চিঠি তারা ২২/১০/৯৪ সংখ্যায় ছাপিয়ে দেয়। ওটাও অম্লান দত্তের লেখার প্রতিবাদ পত্র তবে ২৯/৬-এর প্রতিবাদ পত্রের সঙ্গে এর তফাত এই যে অম্লান দত্তের ইসলামী বহুবিবাহসংক্রান্ত অনৈতিহাসিক মতের খণ্ডনই এর উদ্দেশ্য ছিল,—২৯/৬-এর চিঠির মতো তাঁর সামগ্রিক বক্তব্যের খণ্ডন এর লক্ষ্য ছিল না। তা নাই থাক, মিথ্যার ঐটুকু প্রতিবাদকে স্বীকৃতি দেবার জন্যও দেশের সম্পাদকমণ্ডলী আমার কৃতজ্ঞতাভাজন, কিন্তু তার দ্বারা 'দেশ' সম্বন্ধে এবং সাধারণভাবে সেকুলার মীডিয়া সম্বন্ধে আমার মূল কথাটা অস্বীকৃত হচ্ছে না। এই মীডিয়া হিন্দুর শত্রু এবং ইসলামের মিত্র। ঐটেই ভারতের 'সেকুলারিজম' নীতির মূলতত্ত্ব।

প্রশ্ন উঠবে, আমার কথার প্রমাণ কী? প্রমাণ এই যে, আমার দ্বিতীয় চিঠিটা প্রতিবাদপত্র হিসাবে লেখা হলেও ওতে অম্লান দত্তের হিন্দুবিদ্বেষ মূলক ইসলামপ্রেমের কোনো উল্লেখ ছিল না। লেখাটি ছিল তাত্ত্বিক ও নিস্তেজ এমন কি ইসলামী বহুবিবাহের নারীঘাতী রূপ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট কথাও ওতে স্থান পায়নি। এই নিস্তেজ চিঠিটা আমি মতলব করেই লিখেছিলাম। আমি দেখাতে চেয়েছিলাম 'দেশ' যদি এই মিথ্যাখণ্ডনকারী নিস্তেজ চিঠিটা ছাপায় তাতে তার সৎ সাংবাদিকতার দাবি আংশিকভাবে প্রমাণিত হবে, কিন্তু এও প্রমাণিত হবে যে 'সেকুলার' মিথ্যার প্রতিবাদ সে ছাপায় না—ততখানি সততা তার নেই। বলা বাহুল্য আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। প্রথম চিঠিটা না ছাপিয়ে, অথচ দ্বিতীয় চিঠিটা ছাপিয়ে, 'দেশ' তার 'সেকুলার' চরিত্রটাই প্রকট করে দিয়েছিল।

তবে এও বলতে হবে আর কোনো সেকুলার কাগজ আমার দ্বিতীয় চিঠিটাও ছাপত না। তাদের হিন্দুজিঘাংসু ইসলাম প্রেমে কোনো খাদ নেই, সেই প্রেমের জন্য সমস্ত 'সেকুলার' মিথ্যাকেই তারা পূজা করে, সমস্ত 'সেকুলার'-বিরোধী সত্যকেই তারা পদাঘাত করে। 'দেশ' পত্রিকা আজো সত্যাসত্য সম্বন্ধে অতটা নির্বিবেক ও নিরঙ্কুশ হতে পারেনি। এভাবে দেখলে দেশজোড়া সেকুলার মীডিয়ার মধ্যে 'দেশ'কে বলতে হয় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।[22]

[22]কৌতুহলী পাঠক ২২/১০/৯৪ সংখ্যার দেশ পত্রিকায় আমার লেখা দ্বিতীয় চিঠিটা দেখে নিতে পারেন। এখানে ঐ চিঠির পুনরুদ্ধৃতি অনাবশ্যক।